বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত

গবেষক:
আফরোজা জাহান
পরীক্ষার রোল: ০৩
নিবন্ধন নম্বর: ৪১৩
শিক্ষাবর্ষ: ১৯৯৯-২০০০

তত্ত্বাবধায়ক:
অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০০৬

RB
B
364.154
JAB
C3

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

M.

404150

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

GIFT

404150

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
404150

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, আফরোজ জাহান-এর গবেষণা "বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া" আমার বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য মানসম্মত হয়েছে।

তারিখ: ২০/০৮/২০০৬ ইং

চৌধুরী রফিকুল আবরার
(তত্ত্বাবধায়ক)
অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Professor
Deptt. of International Relations
University of Dhaka

Department of International Relations ★ University of Dhaka ★ Estd. 1947

404150

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

নারী ও শিশু পাচার বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বড় ধরণের জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের অসহায় নারী ও শিশুকে তাদের দরিদ্রতার সুযোগে একশ্রেণীর মানবতা বিরোধী চক্র বিয়ে, চাকুরী ইত্যাদি নানা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে বিদেশে পাচার করছে। গত কয়েক বছর ধরেই পত্রিকার পাতায় এইসব নারী ও শিশু পাচারের খবর আসছে- যদিও তা খুবই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে, পাচারকৃতদের মধ্যে যারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হচ্ছে কেবল তাদের খবরই প্রকাশ পাচ্ছে, বাকিরা সংখ্যায় কি পরিমাণ তা জানার তেমন কোন গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তাই নারী ও শিশু পাচারের ভয়াবহতা থেকে পাচারকৃতদের বের করে আনার জন্য উদ্ধারের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও কার্যকরী করতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ বিষয়ে একটি গবেষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালের জুলাই মাসে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে যেসব এন.জি.ও কাজ করে যেমন- বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এ্যাটসেক (Action Against Trafficking And Sexual Exploitation of Children), আইন ও সালিশ কেন্দ্র ইত্যাদি এন.জি.ও এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বুলেটিন সংগ্রহ করে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব দাঁড় করানো হয়।

404150

প্রকল্প প্রস্তাবটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর উক্ত বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার এর তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ শুরু করা হয়। গত ২৮জুলাই - ১আগস্ট ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত এবং রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্স ইউনিট (রামরু) কর্তৃক আয়োজিত - নারীও শিশু পাচার প্রতিরোধে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টি.ও.টি) কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনসহ পাচারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক ধারণা লাভ হয় এবং ''নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধি'' শীর্ষক দুই বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে পাচার বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান লাভ হয়। এছাড়া গত ২৪ মার্চ- ৩০ মার্চ ২০০৩ সালে রামরুর অর্থায়নে গ্রহণকারী দেশে নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা প্রকল্পের অধীনে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে কলকাতা যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে বিভিন্ন এন.জি.ও (যারা এ বিষয়ে কাজ করে) এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, কলকাতাস্থ বাংলাদেশী মিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার এর সাথে আলোচনা, সরকারী, বেসরকারী শেল্টারহোম পরিদর্শন এবং লিলুয়া হোমে আশ্রয়প্রাপ্ত মেয়েদের সাথে এবং রেডলাইট এরিয়া- বৌবাজারে যৌনকর্মে নিয়োজিত পাচারকৃত বাংলাদেশী নারীদের সাথে কথা বলা- এসবের ভিত্তিতে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর প্রক্রিয়া, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ ধারনা লাভ হয়। এরপর বাংলাদেশে পাচার এবং নারী ও শিশু আধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্র আছে এমন প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়কৃতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহের কাজে প্রায় এক বছর এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অনুমতি পেতে এক বছরের বেশী সময় ব্যয় হয়। সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাওয়ার পর প্রথমে মার্চ, ২০০৫ সালে এসিডি (এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট) রাজশাহী এর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত পাচারকৃতদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এরপর এপ্রিল, ২০০৫ সালে এসিএসআর (Association for Correction and social Reclamation- সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি); মে, ২০০৫ সালে বিএনডাব্লিউএলএ (Bangladesh National Women Lawyers' Association- বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি); সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ট্রানজিটহোম, ঢাকা এবং অক্টোবর, ২০০৫ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, যশোর এর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত পাচারকৃতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া তাত্ত্বিক জ্ঞানলাভের জন্য সি ডব্লিউ সি এস (Centre for Women and Children Studies), এ্যাটসেক (Action against Trafficking and Sexual Exploitation of Children), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, রামরু, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বিএনডাব্লিউএলএ ইত্যাদি এনজিও এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর ডকুমেন্টেশন সেন্টার এবং জাতীয় গণ গ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পাচার এবং নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই দীর্ঘ সময় গবেষণার প্রেক্ষিতে ''বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া'' শীর্ষক শিরোনামে একটি গবেষণা পত্র রচনার প্রয়াস হয়। আশা করা যায় গবেষণা পত্রটি দ্বারা এই বিষয়ের উপর গবেষণা করতে ইচ্ছুক পরবর্তী গবেষকগণ এবং পাচার ও নারী, শিশু অধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন সংগঠন এর সমাজকর্মীবৃন্দ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার সব কিছুর জন্য সর্ব প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহান আল্লাহ্‌র কাছে। এরপর আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার প্রাণপ্রিয় বাবা-মাকে যাদের পূর্ণ সমর্থন, সহযোগীতা, অনুপ্রেরণা ও ত্যাগের ফলে আমি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চৌধুরী রফিকুল আবরার যিনি আমার গবেষণা কার্য তত্ত্বাবধানে সম্মতি জ্ঞাপন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আমার গবেষণা সুষ্ঠভাবে সম্পাদনার জন্য মূল্যবান পরামর্শ ও কঠোর দিক-নির্দেশনা দানের মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি আরো কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং সিডাব্লিউসিএস এর সভাপতি প্রফেসর ইসরাত শামীম এর প্রতি যিনি তার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময় দিয়েছেন, আমার গবেষণা পত্রটি পড়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন।

আমার উত্তরদাতা পাচারকৃত নারী ও শিশু এবং আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনাকারী বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন এনজিও এবং সরকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা যাদের ইতিবাচক সাড়া না পেলে আমার গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না বলে আমি মনে করি- তাদের সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া যেসকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে রামরু তার লাইব্রেরী ব্যবহার থেকে শুরু করে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ক সকল গবেষণা, ওয়ার্কসপ, সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে আমার তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাই হাসান এর প্রতি যে সার্বক্ষনিক আমার পাশে পাশে থেকে উৎসাহ দিয়ে, এডিটিং এ সহায়তা করে, আর্থিকভাবে সাহায্য করে আমার গবেষণা কার্যকে সহজসাধ্য করেছে।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমার অকৃত্রিম বন্ধু সোমা দে (প্রভাষক, উইমেন'স স্ট্যাডিস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জিয়াউল ইসলাম (সহকারী সিস্টেম এ্যানালিস্ট, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) এর প্রতি যারা ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তথ্য দিয়ে, দিক-নির্দেশনা দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছে। কৃতজ্ঞ আমি অন্ধ বন্ধু খলিল এবং বন্ধু প্রতিম ভাই মিজানের প্রতি যাদের মাধ্যমে জেনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কিছু।

সর্বোপরি আমি আমার অন্যান্য ছোট ভাই-বোন সুজন, সুবর্ণা, সিদ্দিক ও মিতু এবং মামী শাহানাজ ও ছোট কাকা মাগফুর রহমান এর প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমার গবেষণাকে এগিয়ে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

আফরোজ জাহান

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্ব জুড়েই ''জেন্ডার'' ইস্যু একটি বহুল আলোচিত বিষয়। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য অবসান তথা ''জেন্ডার'' সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আয়োজিত হচ্ছে বিভিন্ন সম্মেলন, গৃহীত হচ্ছে সনদ এবং স্বাক্ষরিত হচ্ছে নানা চুক্তি। অনুরূপভাবে শিশু অধিকার ও শিশুর নিশ্চিত, নিরাপদ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সোচ্চার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন। এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। ফলে এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে নারী ও শিশু উন্নয়ন ও অধিকারের পক্ষে সচেতনতা। তারপরও নিজের এবং পরিবারের জীবন ধারণের জন্য মৌলিক চাহিদাটুকু মেটাবার তাগিদে প্রতিনিয়ত পাচার হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নারী ও শিশু। দাসত্ব, পতিতাবৃত্তি এবং বাধ্যতামূলক শ্রম-এ নিয়োজিত হওয়ার জন্য বিক্রি, বানিজ্য এবং বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিদিন সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছে অসহায় নারী ও শিশু। বাংলাদেশ থেকে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্য; নেপাল থেকে ভারত; ভুটান থেকে থাইল্যান্ড; ভিয়েতনাম থেকে কম্পোচিয়া; ফিলিপাইন থেকে জাপান-এ পাচার হচ্ছে এসকল নারী ও শিশু। গত কয়েক বছর ধরেই পাচারের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আবার উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও প্রয়াজনের তুলনায় অপ্রতুল।

উক্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা বা পাচারের প্রেক্ষিত, গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা, গবেষণার ক্ষেত্র, গ্রন্থ পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু পাচারের ব্যপকতা তুলে ধরা, পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের সীমাবদ্ধতা ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন জনসমাজকে অবহিত করানোই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য যেসকল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে সংক্ষেপে তা হচ্ছে- পাচারের উপর কাজ করে এমন সংগঠনসমূহের গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা, গ্রন্থ, সাময়ীকি, পুস্তিকা, নিউজলেটার, পেপারকাটিং ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রন্থ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পাচার প্রতিরোধ এবং পাচারের অন্যান্য দিক সম্পর্কে গবেষণা হলেও পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর উপর বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়া ছাড়া তেমন ব্যাপক কোন গবেষণা হয়নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাচারের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা, অভিবাসন, মানবচোরাচালান, প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া পাচারের পরিসংখ্যান, পাচারের কারণ, পদ্ধতি, পথ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সালের জাতিসংঘের প্রোটোকল অনুযায়ী যেকোন ধরণের শোষণের উদ্দেশ্যে, জোর খাটিয়ে, ধাপ্পা, ছলচাতুরী, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে লোক সংগ্রহ, স্থানান্তর, আশ্রয়দান ও অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ ইত্যাদি যেকোন কার্যক্রমকে পাচার বলে গন্য করা হয়। আর অভিবাসন হচ্ছে ব্যক্তির এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর। প্রত্যাবাসন হচ্ছে সীমান্ত অতিক্রমকারী পাচারকৃত ব্যক্তির নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত পাচারকৃতের চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে পুনর্বাসন। পাচারের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে আই,ও,এম (ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ পাচার হয়ে থাকে। পাচারকৃতদের উদ্ধার কার্যক্রমের সাথে জড়িত বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির মতে প্রতিবছর বাংলাদেশে ১০,০০০ নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। দরিদ্রতা এবং অশিক্ষায় নিমজ্জিত বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিতিশীলতা, অরক্ষিত সীমানা, প্রশাসনিক দূর্বলতা, একশ্রেণীর দূর্নীতি পরায়ণ কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং সর্বোপরি পাচারকৃত ব্যক্তির সচেতনতার অভাব-এর কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মানুষ পাচার হওয়ার দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। পাচারের প্রধান কারণ হিসেবে উৎস দেশের সমস্যা ও গ্রহণকারী দেশের চাহিদা এই দু'টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাচারের পদ্ধতি হিসেবেও প্রধান দু'টি বিষয়কে সনাক্ত করা হয়েছে, যেমন- পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু সংগ্রহের পদ্ধতি এবং সীমান্ত পারাপারের পদ্ধতি। এরপর পাচারের পথ, নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা, পাচারের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে পাচারকৃতদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখা যায় পাচারকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু (৮৩.৩৩%) এবং ৬২.৫০% অশিক্ষিত ও ৪৩.৭৫% এর পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০ টাকার কম। আলোচ্য অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর বিশ্লষণে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে পাচারকৃতদের মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে পাচারের বিভিন্ন পর্যায় যেমন - পাচার হওয়ার আগে, বিদেশে অবস্থানকালে, ফিরে আসার পর পাচারকৃতদের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। দেখা যায় পাচারের প্রতিটি স্তরেই পাচারকৃতের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও বিচিত্র। এই অধ্যায়ে পাচারকৃতদের কিছু কেইস স্ট্যাডি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া পাচারের সহযোগীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাদের স্বীকারোক্তি উপস্থাপিত হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে। উক্ত অধ্যায়ের শুরুতে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এনজিওসমূহের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যে যে চারটি সংস্থার আশ্রয়কেন্দ্র থেকে পাচারকৃতদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে সেই সংস্থাগুলোর প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রত্যাবাসন ও

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় আইন ও নীতিমালা এবং এর বাস্তব প্রয়োগ এর দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পরিলক্ষিত হয় যে, পাচার বিরোধী বিভিন্ন আইন ও নীতিমালার মধ্যে বেশীরভাগ আইনই পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক এবং সেতুলনায় প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত আইন অপ্রতুল। আবার প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনসমূহের বাস্তব প্রয়োগ আরো সীমিত। সপ্তম অধ্যায়ে সরকার ও এনজিওসমূহের প্রতি প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রায়োগিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশের মাধ্যমে উপসংহার টানা হয়েছে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে এদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে পাচারকৃতদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে রচিত হয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
বস্তু সংক্ষেপ	v
সারণির তালিকা	xii
চিত্রের তালিকা	xiii
বক্সের তালিকা	xiii
শব্দ সংক্ষেপ	xiv
প্রথম অধ্যায় - ভূমিকা	১ - ১৪
গবেষণার যৌক্তিকতা	৩
গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
অনুকল্প	৫
গবেষণা পদ্ধতি	৫
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৬
গ্রন্থ পর্যালোচনা	৭
উপসংহার	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় - নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা	১৫ - ৪৪
পাচারের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা	১৬
পাচার, অভিবাসন ও মানবচোরাচালান	১৭
প্রত্যাবসন	১৯
পুনর্বাসন	১৯
পাচারের পরিসংখ্যান	১৯ - ২২
আন্তর্জাতিক	২০
বাংলাদেশ	২০
নারী ও শিশু পাচারের কারণ	২৩ - ৩১
উৎস দেশের সমস্যা	২৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণকারী দেশের চাহিদা	২৯
বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশু পাচারের পদ্ধতি	৩১ - ৩৫
পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু সংগ্রহের পদ্ধতি	৩২
সীমান্ত পারাপারের পদ্ধতি	৩৩
পাচারের পথ বা রুট	৩৫
নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা	৩৮ - ৩৯
নারী পাচারের বাস্তবতা	৩৮
শিশু পাচারের বাস্তবতা	৩৮
পাচারের ফলাফল	৩৯
উপসংহার	৪৩
তৃতীয় অধ্যায় - মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ	৪৫ - ৬১
প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ	৪৮ - ৬০
পাচারকৃতের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৪৮ - ৫২
বয়স ও লিঙ্গভেদে বন্টন	৪৮
বৈবাহিক অবস্থা	৫০
শিক্ষাগত যোগ্যতা	৫১
অর্থনৈতিক অবস্থা	৫২
পাচারকৃতের কাজের ক্ষেত্র	৫৩
পাচারকৃতদের ঠিকানা বা পাচারের অঞ্চল	৫৪
প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে পাচারকৃতদের মন্তব্য	৫৬
উপসংহার	৬০
চতুর্থ অধ্যায় - পাচরের বিভিন্ন স্তরে পাচারকৃতের অভিজ্ঞতা	৬২ - ৭১
গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত অভিজ্ঞতা	৬৩
গ্রহণকারী দেশে অবস্থানকালে অভিজ্ঞতা	৬৫
উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের পর নিজ দেশে ফিরে আসার পর অভিজ্ঞতা	৬৮
দুবাই ফেরত পাচারের সহযোগী নারী ও পুরুষের স্বীকারোক্তি	৭০
উপসংহার	৭১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় - প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া: সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ ৭২ - ৯৭

উদ্ধার ৭৩ - ৭৫

উৎস দেশে উদ্ধার ৭৩

গ্রহণকারী দেশে উদ্ধার ৭৪

প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ৭৫

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ৭৬ - ৮৪

পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ৭৬

পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া ৮০

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সরকারী উদ্যোগ ৮৫ - ৮৯

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮৬

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৮৬

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৮৮

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৮৮

বেসরকারী উদ্যোগ ৮৯ - ৯৬

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৯১

বিএনডাব্লিউএলএ ৯৩

এসিডি ৯৪

এসিএসআর ৯৫

উপসংহার ৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায় - প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া: অধিকার ও বাস্তবতা ৯৮ - ১১৫

আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি ৯৯

আঞ্চলিক সনদ ও চুক্তি ১০৩

জাতীয় আইন ও নীতিমালা ১০৫

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বাস্তবতা ১০৭ - ১১৪

উদ্ধার ও প্রত্যাবাসন ১০৮

পুনর্বাসন ১১১

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের সমস্যা ১১৩

উপসংহার ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় - উপসংহার	১১৬ - ১২৩
উপসংহার	১১৭
সুপারিশ	১১৯ - ১২৩
প্রত্যাবাসনের জন্য সুপারিশ	১১৯
পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশ	১২১
তথ্যসূত্র	১২৪- ১৩১
পরিশিষ্ট - ১ : প্রশ্নমালা	১৩২
পরিশিষ্ট - ২ : পাচারের বিরুদ্ধে গৃহীত সনদ ও চুক্তিসমূহ	১৩৭
পরিশিষ্ট - ৩ : পাচারকৃতদের চিত্র	১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণির তালিকা

সারণি #	সারণি পরিচিতি	পৃষ্ঠা #
২.১	জানুয়ারী ২০০০-জুন ২০০৩ পর্যন্ত নিখোঁজ, অপহৃত ও পাচারকৃত শিশু	২২
২.২	জানুয়ারী ২০০০-জুন ২০০৩ পর্যন্ত নিখোঁজ, অপহৃত ও পাচারকৃত নারী	২২
৩.১	বয়সভেদে পাচারকৃত ছেলেদের পরিসংখ্যান	৪৯
৩.২	বয়সভেদে পাচারকৃত মেয়েদের পরিসংখ্যান	৪৯
৩.৩	পাচারকৃতদের সার্বিক পরিসংখ্যান	৫০
৩.৪	পাচারকৃত মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা	৫১
৩.৫	পাচারকৃতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৫১
৩.৬	পাচারকৃতদের মাসিক আয়	৫২
৩.৭	পাচারকৃতের কাজের ক্ষেত্র	৫৩
৫.১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ	৮৯
৫.২	এসিডির আশ্রয়কেন্দ্র ভিত্তিক সেবাসমূহ (২০০৩ সাল)	৯৫
৬.১	জানুয়ারী ২০০২-জুন ২০০৩ পর্যন্ত উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশু	১০৯
৬.২	উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকাল	১১২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের তালিকা

চিত্র #	চিত্র পরিচিতি	পৃষ্ঠা #
২.১ (মানচিত্র)	নারী ও শিশু পাচারের আন্তর্জাতিক পথ	৩৭
৩.১ (মানচিত্র)	বাংলাদেশে পাচারের উৎস অঞ্চলসমূহ	৫৫
৫.১ (রেখাচিত্র)	পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া	৭৯
৫.২ (রেখাচিত্র)	আর্থ-সামাজিক একত্রীকরণ	৮২
৫.৩ (রেখাচিত্র)	সফল সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ	৮৩
৫.৪ (রেখাচিত্র)	অসফল সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ	৮৪
৬.১ (লেখচিত্র)	পাচার ও উদ্ধারের তুলনামূলক চিত্র	১০৯
৬.২ (লেখচিত্র)	উদ্ধারের চিত্র	১১১

বক্সের তালিকা

বক্স #	বক্স পরিচিতি	পৃষ্ঠা #
৪.১	কেইস স্ট্যাডি- ১	৬৪
৪.২	কেইস স্ট্যাডি- ২	৬৫
৪.৩	কেইস স্ট্যাডি- ৩	৬৭
৪.৪	কেইস স্ট্যাডি- ৪	৬৭
৪.৫	কেইস স্ট্যাডি- ৫	৬৯
৪.৬	কেইস স্ট্যাডি- ৬	৭০

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংক্ষেপ

এসিডি (ACD) - এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (Association for Community Development)

এসিএসআর (ACSR) - এ্যাসোসিয়েশন ফর কারেকশন এ্যান্ড সোশাল রিক্লেমেশন (Association for Correction and Social Reclamation)

এ্যাটসেক (ATSEC) - এ্যাকশন এগেইনষ্ট ট্রাফিকিং এ্যান্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়েটেশন অব চিলড্রেন (Action Against Trafficking and Sexual Exploitation of Children)

বিডিআর (BDR) - বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles)

বিএনডাব্লিউএলএ (BNWLA) -বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন ল'ইয়ারস এ্যাসোসিয়েশন (Bangladesh National Women Lawyers' Association)

সিডো (CEDAW) - কনভেনশন অন দি ইলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women)

সিপিসিসিটি (CPCCT) - কো-অরডিনেটেড প্রোগ্রাম টু কমব্যাট চাইল্ড ট্রাফিকিং (Co-ordinated Programme to Combat Child Trafficking)

সিডাব্লিউসিএস (CWCS) – সেন্টার ফর উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন ষ্ট্যাডিস (Centre For Women and Children Studies)

সিডাব্লিউটিপি (CWTP) – চাইল্ড এ্যান্ড ওমান ট্রাফিকিং প্রিভেনশন প্রোগ্রাম (Child and Woman Trafficking Prevention Programme)

ড্যাম (DAM) - ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (Dhaka Ahsania Mission)

আইসিডিডিআরবি (ICDDRB) – ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়া ডিসিসেস রিসার্স অব বাংলাদেশ (International Centre for Diarrhoeal Diseases Research of Bangladesh)

Dhaka University Institutional Repository

আইওএম (IOM) - ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (International Organization for Migration)

এনজিও (NGO) - নন-গভর্মেন্টাল অরগানাইজেশন (Non-Governmental Organization)

প্ল্যাগ (PLAGE) - পলিসি লিডারশিপ এ্যান্ড জেন্ডার ইকিউলিটি (Policy Leadership and Gender Equlity)

রামরু (RMMRU) - রেফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্স ইউনিট (Refugee and Migratory Movements Research Unit)

সার্ক (SAARC) - সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (South Asian Association for Regional Co-operation)

ইউনিসেফ (UNICEF) - ইউনাইটেড ন্যাশনস চিলড্রেন ইমারজেন্সী ফ্যান্ড (United Nations Children's Emergency Fund)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে মাদক ও অস্ত্র ব্যবসার পরই নারী ও শিশু পাচার তৃতীয় বৃহত্তম একটি লাভজনক ব্যবসা। জাতিসংঘের তথ্যানুসারে সারা বিশ্বে বছরে চার বিলিয়ন মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার হয় এবং এই ব্যবসা থেকে প্রতি বছর আয় হয় পাঁচ থেকে সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১]। পাচারের ধারণাটি নতুন হলেও পাচারের প্রক্রিয়া চলে আসছে সেই আদিতে দাস প্রথা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। বর্তমান বিশ্বের মানবাধিকারের অন্যতম প্রবক্তা আমেরিকা আজ এই উন্নতির চরমে পৌছেঁছে দাস তথা পাচার হয়ে আসা মানুষের অনৈতিক শ্রমের সিঁড়ি বেয়ে। পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা হলেও আমাদের দেশে এর ভয়াবহতা চরম আকার ধারণ করেছে। দরিদ্রতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতার সুযোগে ভালো থাকা-খাওয়া তথা উন্নত জীবনের প্রলোভনকে পুঁজি করে নারী ও শিশু পাচারের এই অনৈতিক ব্যবসা করছে একশ্রেণীর মানবতা বিরোধী চক্র। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সন্তানের আধিক্য, তালাক, ফতোয়া ইত্যাদি কারণে নষ্ট হচ্ছে সামাজিক স্থিতিশীলতা। ফলে কমে যাচ্ছে পারিবারিক দায়বদ্ধতা। অনেক সময় সন্তান কোথায় যায়, কি করে তা বাবা-মা খেয়াল রাখতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় সৎমা তার সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে, স্বামী তার বউকে তুলে দিচ্ছে অন্যের হাতে। আবার দেখা যায়, বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যাক্তা নারী একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশায় আটকে যায় পাচারকারীর বেড়াজালে।

দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকা থেকে নারী ও শিশু পাচার হয়। আর গ্রহণকারী দেশ হচ্ছে - ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর। ভারতেই কেবল বর্তমানে ১৮ বছরের কমবয়সী প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার। পাচারকৃত নারী ও শিশুকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা কিংবা কৃতদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ধনী ব্যক্তিরা রক্ষিতা হিসেবেও মেয়েদেরকে ব্যবহার করে থাকে। পর্ণোগ্রাফি, অশ্লীল ছবি, নাইট ক্লাব ও ম্যাসেজ পার্লারে বিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য পাচারকৃত নারী ও শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, জাহাজ ভাঙ্গা, মাদক ব্যবসা, চোরাচালান, উটের জকি, ভিক্ষাবৃত্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার হয়। সম্প্রতি রামরু (রেফিউজি এ্যান্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে কলকাতার বৌবাজারসহ বিভিন্ন রেডলাইট এরিয়ায় যৌনকর্মী হিসেবে নিয়োজিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী/ কিশোরীই

[১] Janice G. Raymond, Guide to the New UN Trafficking Protocol, Coalition Against Trafficking in Women, USA, 2001.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশী যারা পাচারের শিকার হয়ে এখানে স্থান পেয়েছে এবং বাধ্য হচ্ছে যৌনকর্ম করতে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ইউনিসেফ-এর সহায়তায় কলকাতার একটি এনজিও 'সংলাপ' যৌনকর্মীদের উপর একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে, সেখানে দেখা যায় যে দিল্লীতে একটা বস্তিতেই এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ বাংলাদেশী বাস করে যারা যৌনকর্মে নিয়োজিত। স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে এবং শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের পতিতালয়গুলিতে ৫ লক্ষের বেশী নারী ও শিশু রয়েছে[২]। পাচারের এ ব্যাপকতায় তুলনায় উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের সংখ্যা খুবই নগন্য। কলকাতায় পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে সিনি আশা (CINI- ASHA) নামক এনজিও এর তথ্যানুসারে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত ভারত থেকে মাত্র ৫/ ৬ জন শিশুকে বাংলাদেশে প্রত্যাবাসিত করা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকার হিসেব মতে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের মধ্যে মাত্র পাঁচ ভাগের সন্ধান পাওয়া যায়, বাকী ৯৫ ভাগই নিখোঁজ থাকে[৩]। আবার উদ্ধারপ্রাপ্তের পর আইনগত ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রত্যাবাসনে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এরপর পরিবারে পুনরেকত্রীকরণ এবং সামাজিক পুনর্বাসনেও দেখা দেয় নানা সমস্যা। এসব সমস্যা বিবেচনায় রেখে আলোচ্য গবেষণায় নারী ও শিশু পাচারের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সীমাবদ্ধতা ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

নারী নির্যাতন তথা নারী সহিংসতার একটা প্রকট দিক হচ্ছে নারী পাচার। আবার যে বয়সে একজন শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের দায়িত্ব নেওয়া উচিত পরিবারের অভিভাবক এর সে বয়সে পুরো সংসারের দায়িত্বই অনেক সময় নিতে হয় শিশুটিকে। আর এ কারণে জীবিকার তাগিদে পথে নেমে পাচারের মতো নৃশংসতার স্বীকার হয় শিশুরা। বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সূত্র মতে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ২০ হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এশীয় দেশগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাচারের হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। ১৯০৪ সালে প্রনীত The International Agreement for the Suppression of the White Slave Trade থেকে ২০০০ সালের Trafficking Victims Protection Act পর্যন্ত আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে অনেক আইন ও সনদ প্রণীত হলেও পাচারের অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। তবে আশার কথা এই যে, দেরীতে হলেও গত জুলাই, ২০০৪ সাল থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা যৌথভাবে পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের মূল্যায়নে গত ৩ জুন, ২০০৫

[২] দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ নভেম্বর, ২০০৫।
[৩] দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪ এপ্রিল, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

সালে US State Department কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে গত এক বছরে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে অভিহিত করে বাংলাদেশের অবস্থান Tier –3 (Watch list) থেকে Tier –2 তে উন্নীত করা হয়েছে[৪]। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ আরো বলেছে যে, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের ন্যূনতম মানে পৌঁছায়নি[৫]। তবে সাফল্যের এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পাচার প্রতিরোধে বিবিধ কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে। কিন্তু অন্তরালে থেকে যাচ্ছে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের দিকটি। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে গৃহীত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ৫(১) এ নারী ও শিশু পাচারের শাস্তির কথা বলা হলেও পাচারকৃতদের বিষয়ে কিছু উল্লেখিত হয়নি। এছাড়া একই আইনের ধারা ৫(খ) ও ৬(ক) প্রদত্ত পাচারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে ভিকটিম অর্থাৎ পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে বিদেশের মাটিতে পাচারকৃতদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের আইনে তাদের অধিকার রক্ষার কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। তাছাড়া পাচার বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ গবেষণায় পাচার প্রতিরোধ, পাচারের কারণ, পদ্ধতি, ফলাফল ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর উপর ব্যাপক কোন গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়নি। তাই পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর বিষয়টি সংযোজনের মাধ্যমে পাচার বিষয়ক গবেষণায় সৃষ্ট শূন্যতা পুরণের ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা কর্মটির মূল উদ্দেশ্য হলো -

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু পাচার সমস্যার ব্যাপকতা কতখানি এবং পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন কল্পে কতটুকু কাজ হয়েছে ও সীমাবদ্ধতাসমূহ কি তা নির্নয় করা।

২. পাচারের প্রেক্ষিতে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে জনসচেতনতা বাড়ানো।

---

[৪] নারী ও শিশু পাচার রোধ সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৩ জুন ২০০৫।

[৫] প্রথম আলো, ০৪ জুন, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩. পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে এবিষয়ে কাজ করে এমন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দিক নির্দেশনা পেতে পারে।

৪. সর্বোপরি এগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যার প্রায়োগিক দিক-এর উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ দাঁড় করানো।

অনুকল্প

বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী তথ্য অনুযায়ী স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১০ লক্ষ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। কিন্তু সে হিসেবে প্রত্যাবাসনের সংখ্যা খুবই নগন্য। বিদেশের মাটিতে উদ্ধারপ্রাপ্তের পরও আইনগত জটিলতার কারণে প্রত্যাবসনে সময় লাগে বছরের পর বছর। আবার পাচাকৃতদের প্রত্যাবাসনের পর এবং অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার নারী ও শিশু উদ্ধারপ্রাপ্তের পর তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছেঃ

১. বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিবেদন, দলিল এবং বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কসপে পঠিত পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. নারী ও শিশু পাচার, নারী অধিকার, নারী নির্যাতন, শিশু অধিকার, শিশু নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা পত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩. নারী ও শিশু পাচার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টসমূহে তাত্ত্বিক যে সমস্ত কাজ হয়েছে তা সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৪. পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর লক্ষ্যে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি,

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি ইত্যাদি এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে পাচার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৫. উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের জন্য অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ঢাকায় অবস্থিত ট্রানজিটহোম ও যশোরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্র, রাজশাহীতে অবস্থিত এসিডির আশ্রয়কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত বিএনডাব্লিউএলএ-এর আশ্রয়কেন্দ্র ও এসিএসআর-এর আশ্রয়কেন্দ্রে প্রাপ্ত ৪১ জন নারী ও শিশুর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ট্রানজিটহোমে প্রাপ্ত ৮ জন পাচারের সহযোগী পুরুষ ও মহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

৬. এক সপ্তাহ কলকাতায় অবস্থান করে সেখানকার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশী নারী ও শিশুদের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে আশ্রয়কেন্দ্র এবং প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের উপর কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এবং কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র লিলুয়াহোমে আশ্রয়প্রাপ্ত ৬ জন মেয়ে শিশুর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং কলকাতার একটি রেডলাইট এরিয়া বৌবাজারে গিয়ে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে আসা যেসব নারী ও কিশোরীরা যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করছে তাদের জীবন বৃত্তান্ত (কেইস ষ্ট্যাডি) নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়ার জন্য যে সমস্ত দেশে নারী ও শিশুরা পাচার হয়ে যায় যেমন ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি দেশের আশ্রয়কেন্দ্র সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে কেবলমাত্র ভারতের কলকাতায় অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্র এবং একটি রেডলাইট এরিয়া যেখানে বাংলাদেশী নারীরা যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে সেখানে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের চারটি প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রত্যাবাসিত নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও প্রয়োজনের তুলনায় সময় অনেক বেশী ব্যয় হয়েছে। কারণ প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুমতি পেতে সময় লেগেছে। এছাড়া দেখা যায় যে প্রত্যাবসনের পর পাচারকৃতদের মানসিক স্থিরতার জন্য কিছুদিন কারো সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয় হয় না, এর মধ্যে তার পরিবারের ঠিকানা নিশ্চিত হতে পারলে

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে শুধুমাত্র যাদের ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজে পুনরেকেত্রীকরণে সমস্যা দেখা দেয় তারাই দীর্ঘ সময় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করে। ফলে এতটা সময় ব্যয় করে আশ্রয়কেন্দ্রে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখা যায় খুব অল্প সংখ্যক পাচারকৃত নারী ও শিশু সেখানে অবস্থান করছে। এছাড়া পুনর্বাসনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য পর্যাপ্ত পুনর্বাসিত নারী ও শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব হয়নি। কারণ এ ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের দায়িত্বে আছে তাদের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পুনর্বাসন পরবর্তী ফলোআপ-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। এসব প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে এবং কিছু সীমাবদ্ধতাসহ দীর্ঘ সময় নিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

গোপনীয় ও অনৈতিক ব্যবসা পাচারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে পাচার বিষয়ক প্রথম দিককার গবেষণায় পাচারের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, পথ, ফলাফল ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে যার অধিকাংশই পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক। প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন বিষয়ে তেমন কোন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হয়নি।

নিউজ নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদনা ও প্রকাশনায় Human Trafficking: Children and Women are the Worst Victims Bangladesh Must Act Fast to Stop the Scourge শিরোনামে মাহফুজুর রহমান কর্তৃক একটি পাচার বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয় সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে। উক্ত গবেষণা গ্রন্থটিতে মানব পাচারের বিশেষ করে এর ভয়াবহ শিকার নারী ও শিশু পাচারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের পাচারে সার্বিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে পাচারের ইতিহাস, পাচারের সংজ্ঞা, পাচারকারী চক্র, পাচারের লক্ষ্য, কৌশল, পরিণতি ইত্যাদি দিকগুলো সংক্ষেপে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। দক্ষিণ এশিয়ায় পাচারের উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার এবং গ্রহণকারী দেশ হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান-এর পাচারের সার্বিক চিত্র দেখানো হয়েছে গ্রন্থটিতে। এছাড়া এশিয়ার অন্যান্য গ্রহণকারী দেশ যেমন- চীন, জাপান ও থাইল্যান্ড-এর পাচারের অবস্থা এবং এসব দেশসমূহে পাচারের পথ উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পাচারের ক্ষেত্র হিসেবে এবং ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ঢাকা শহরের উল্লেখ করেছেন। দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর স্থান থেকে পাচার হয়ে নারী ও শিশু ঢাকা এসে পতিতাবৃত্তিসহ বিভিন্ন কষ্টকর ও অনৈতিক শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। আবার ঢাকাকে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন পতিতালয়ে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রেরণ করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক পাচারের ক্ষেত্রেও ঢাকাকে রুট হিসেবে ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, অভিবাসনের ক্ষেত্রে জাতীয় আইনের অপর্যাপ্ততার কারণে অভিবাসি নারীরাও অনেক সময় পাচারের শিকার হয়। পাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, আইনের প্রায়োগিক জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাচার প্রতিরোধে গৃহিত পদক্ষেপ ও এর সীমাবদ্ধতা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন এন.জি.ও নেতৃবৃন্দের সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে পাচারকৃত শিশুদের উদ্ধারের একটা পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরে কয়েকজন উদ্ধারকৃত ও প্রত্যাবাসিত নারী ও শিশুর ঘটনার বিবরণ (কেইস ষ্ট্যাডি) উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থটির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পাচারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তথ্যগত ধারণা তৈরীতে এবং পাচার প্রতিরোধে একটি দিক-নির্দেশনায় গ্রন্থটি বিশেষভাবে সহায়ক।

প্রফেসর ইসরাত শামীম রচিত ''নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ করুন'' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় মে ২০০১ সালে সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন ষ্ট্যাডিজ এর পরিচালনায়। পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে পাচারের সংজ্ঞা, পাচারের ঝুঁকিতে থাকা নারী ও শিশু, পাচারকারী চক্র, পাচারের কারণ, পাচারের কৌশল, পাচারকৃতদের কাজের ধরণ, পাচারের ফলাফল, পাচার রোধে করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে পাচারের সংজ্ঞায় লেখকের নিজস্ব ভাষ্যসহ ইউনাইটেড নেশনস্ জেনারেল এ্যাসেম্বলী, ১৯৯৪-এ দেওয়া সংজ্ঞাও উল্লেখিত হয়েছে। পাচারের কারণ হিসেবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাচারের পর পাচারকৃতদের দিয়ে যেসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হয় তা উল্লেখিত হয়েছে। পুস্তিকাটিতে দক্ষিণ এশিয়ায় পাচারের উৎস দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকার নারী ও শিশু পাচারের একটি পরিসংখ্যানমূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নারী ও শিশু পাচার রোধে জাতীয় আইনসমূহ, সরকারী নীতিমালাসমূহ, আন্তর্জাতিক দলিল/ চুক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলোও পুস্তিকাটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। সবশেষে পাচার প্রতিরোধে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পুস্তিকাটি পাচার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পাচার প্রতিরোধে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির নির্দিষ্ট করণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

উল্লেখিত পুস্তিকা ছাড়াও প্রফেসর ইসরাত শামীম এর "Mapping of Missing, Kidnapped and Trafficked Children and Women: Bangladesh Perspective" শিরোনামে একটি গবেষণা ২০০১ সালে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণা পত্রে বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশু নিখোঁজ, অপহরণ ও পাচারের পরিসংখ্যান এবং এসব নিখোঁজ হওয়া, অপহৃত ও পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধারের চিত্র আনুপাতিক হারে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট ২০০১ সালে আইওএম কর্তৃক প্রকাশিত নাতাশা আহমেদ-এর "In Search of Dreams: Study on the Situation of the Trafficked Women and Children in Bangladesh and Nepal to India" শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে নারী ও শিশু ভারতে পাচার হয়ে কি অবস্থায় রয়েছে তা দেখানো হয়েছে। ভালো খাওয়া-পরার আশায় কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ ও নেপালের নিম্নবিত্তের নারী ও শিশুরা পাচার হয়ে ভারতে কি ধরণের মানবেতর জীবন-যাপন করছে তা তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

আই.সি.ডি.ডি.আর.বি-এর সেন্টার ফর হেল্থ এন্ড পপুলেশন রিসার্স-এর অধীনে এম.শামসুল ইসলাম খান এর সম্পাদনায় ২০০১ সালে "Trafficking of Women and Children in Bangladesh: An Overview" শিরোনামে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত গবেষণায় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বাংলাদেশ-এর প্রেক্ষাপটে পাচারের সমস্যা, কারণ, পদ্ধতি, রুট বা পথ, পরিণতি বা ফলাফল এবং পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে। অধিক জনসংখ্যা, অভিবাসনের আধিক্য, দারিদ্র এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে দক্ষিণ এশিয়াকে পাচারের জন্য একটি অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৮টি ট্রানজিট পয়েন্ট চিহ্নিত করে পাচারের পথ বর্ননা করা হয়েছে। এছাড়া উদ্ধার, পুনর্বাসন, প্রত্যাবাসন, পুনঃএকেত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে পাচার প্রতিরোধে এনজিওদের বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ আলোচিত হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়। বাংলাদেশের নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে একটি সার্বিক ধারণা তৈরীতে গবেষণা গ্রন্থটি সহায়তা করবে এ বিষয়ে গবেণায় আগ্রহী গবেষকদের।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডাব্লিউএলএ)-এর পরিচালনায় "Survey in the Area of Child and Women Trafficking" (1997)- শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পন্ন হয়। উক্ত গবেষণায় বাংলাদেশের কোন্ কোন্ এলাকা থেকে বেশী পাচার হয় এবং বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার ট্রানজিট পয়েন্টগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় সারা বিশ্বের নারী ও শিশু পাচারের পরিসংখ্যান, পাচারকৃতদের অবস্থান অর্থাৎ তারা কোন্ দেশে কি ধরণের অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে এসব বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের সম্পর্কিত বিষয়ও কিছু কিছু স্থান পেয়েছে উক্ত গবেষণায়। সরাসরি পাচার বিষয়ক গবেষণা না হলেও বিএনডাব্লিউএলএ কর্তৃক প্রকাশিত "Violence Against Women in Bangladesh – 2000, 2001, 2002 & 2003; Editor- Advocate Salma Ali; Bangladesh National Women Lawyers' Association (BNWLA)" ধারাবাহিক এই বার্ষিক প্রতিবেদনমূলক গ্রন্থে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন তথা নারী সহিংসতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। নারী সহিংসতার একটি অন্যতম দিক হিসেবে নারী পাচারের বিষয়টিও এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভলিউমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে উল্লেখিত অনুচ্ছেদসমূহ, জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

আইন, দণ্ডবিধি, শ্রম আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, অনৈতিক বৃত্তি আইন-১৯৩৩ (Immoral Traffic Act-1933), কারাবিধি (Jail Code) ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন, যেমন - সিডো (CEDAW) সনদ, শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতার বিভিন্ন দিক যেমন - যৌতুক, বহুগামিতা, অধিক সন্তান জন্মদানের কারণে মাতৃমৃত্যু বিষয়, আত্মহত্যা, শ্বশুড়বাড়ীর আত্মীয়ের দ্বারা নির্যাতন, বাবার বাড়ীর আত্মীয়ের দ্বারা নির্যাতন; জনসহিংসতা (Public Acts of Violence), যেমন - ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, পতিতাবৃত্তি, ফতোয়া, কর্মস্থলে সহিংসতা যেমন- শিল্প প্রতিষ্ঠান, অভিবাসী নারী কর্মী, গৃহপরিচারিকা এদের প্রতি সহিংসতার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর সমালোচনা এবং বর্তমান প্রচলিত আইনের ফাঁক-ফোঁকর আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ ভলিউম এ সহিংসতার চিত্র তুলে ধরার পর পারিবারিক ও জনসহিংসতার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সহিংসতার বিরুদ্ধে সরকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, এসিড সন্ত্রাসে পদক্ষেপ, বিভিন্ন ধর্মের নারীদের ব্যক্তিগত আইনসমূহ, সিডো (CEDAW) সনদ ও বাংলাদেশে নারীদের নাগরিকত্বের অধিকার, নারী নির্যাতন দমন আইন, নারীর সন্তান জন্মদানগত স্বাস্থ্য সমস্যা (Reproductive Health), বাংলাদেশী বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান, দক্ষিণ এশিয়ার নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে ঢাকা ঘোষণা-২০০৩ ইত্যাদি বিষয় ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সহিংসতা রোধে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বারদের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা, গনমাধ্যমের ভূমিকা এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে। ভলিউম গুলোর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে এখানে বাংলাদেশসহ এশিয়া ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন অবস্থানে অবস্থিত নারীদের নির্যতন তথা নারীর প্রতি সহিংসতার এক পরিসংখ্যানমূলক চিত্র এবং এর প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ, আইন, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। নারী পাচার রোধসহ নারী অধিকার আদায়ে সচেষ্ট বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের তথ্য সমৃদ্ধ করবে এই ধারাবাহিক গবেষণা গ্রন্থ।

অধ্যাপক তাসলিম সিদ্দিকি "Transcending Boundaries : Labour Migration of Women from Bangladesh" গ্রন্থে বাংলাদেশের অভিবাসী নারী শ্রমিকরা ভালো কাজের প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে বিদেশের মাটিতে কিভাবে প্রতারণা এবং কতখানি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয় তা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশ থেকে কোন্ কোন্ দেশে কত সংখ্যক দক্ষ ও অদক্ষ নারী শ্রমিক কাজের উদ্দেশ্যে যায় এবং এদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অদক্ষ শ্রমিক যারা বিদেশে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত তা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে অভিবাসি নারী শ্রমিকের সাথে পাচারকৃত নারীর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। উক্ত গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, অফিসিয়াল তথ্যানুযায়ী মোট অভিবাসির সংখ্যার মধ্যে নারী অভিবাসির সংখ্যা খুবই নগন্য (১%) এবং পূর্বের তুলনায় এই হার ক্রমান্বয়ে কমছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

সারা বিশ্বে মহিলাদের নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। এছাড়া পুরুষের তুলনায় মহিলাদের অভিবাসনের খরচও কম[৬]। ফলে নারীদের অভিবাসনের হার আরো বেশী হওয়ার কথা। এছাড়া ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের পর ফিরে আসা অভিবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে শতকরা ২.০৮% নারী ছিল যা নথিভূক্ত অভিবাসী নারীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। সুতরাং দেখা যায় নথিবহির্ভূত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশী। এ কারণে হয়তো অভিবাসী ও পাচারের হারের মধ্যে একটা বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। অনেক সময় আবার নথিবহির্ভূত বা অনিয়মিত অভিবাসীর সাথে পাচারকে মিলিয়ে ফেলা হয়। আবার অনিয়মিত অভিবাসীদের সমস্যা অনেক সময় পাচারকৃতের মতোই হয়ে থাকে। এভাবে বাংলাদেশী অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা, অবস্থান ও পরিস্থিতি এবং এদের নিজ দেশের মতো স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার, এনজিও ও অন্যান্য সংগঠনের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর ফলে হয়তো কাজের উদ্দেশ্যে অভিবাসনের নামে নারী পাচারের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

ইউএস এইড কর্তৃক প্রকাশিত তেরেশা ব্লোশের গবেষণা পত্র "DOING BIDESH" The cross border labour migrstion and trsfficking of women from Bangladesh এ সীমান্ত অতিক্রমকারী অভিবাসী নারী শ্রমিক ও পাচারকৃত নারীর সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। কাজের সন্ধানে সীমান্ত অতিক্রম করে নারীরা কিভাবে পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়, পাচারকৃতের গন্তব্য দেশ ও কাজের ক্ষেত্র ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে এখানে।

ক্যারিন হেইসলার রচিত "বাংলাদেশী শিশুদের উপর যৌননিপীড়ন ও যৌনশোষণ মোকাবিলার লক্ষ্যে কার্যকর অনুশীলন এবং অগ্রাধিকার বিষয়ক পটভূমি প্রতিবেদন" শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর সহায়তায় ২০০১ সালে। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশী শিশুদের উপর যৌনশোষণের একটা সার্বিক চিত্র তুলে ধরে এর মোকাবিলার লক্ষ্যে কিছু কার্যকরী অনুশীলনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। লেখক এখানে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোন মানুষকেই শিশু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি শিশু যৌনশোষণ বলতে যেকোন ধরণের বেআইনী যৌন কার্যকলাপ-এর উদ্দেশ্যে শিশু পাচারকে বুঝিয়েছেন। আমাদের সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনশোষণের ঝুঁকি বেশী থাকে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবটা মেয়েদের উপরই বেশী তাই যেসব পরিস্থিতিতে শিশুরা বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা যৌনশোষণের ঝুঁকিতে থাকে তার উল্লেখ করা হয়েছে গ্রন্থটিতে। এখানে অভিবাসন এর সাথে মানব-পাচার ও আন্তঃসীমান্ত পাচার-এর মধ্যকার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। অনিয়মিত অভিবাসনের সহজ সুযোগ এবং সীমান্ত এলাকায় প্রশাসনের অবহেলার কারণে পাচার কার্য বেশী মাত্রায় সংঘটিত হচ্ছে। আবার অনিয়মিত অভিবাসন ও পাচারের মোকাবিলা করতে গিয়ে দেখা যায় পাচারকারীদের চাইতে পাচারকৃতরাই অধিকতর অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। ফলে

[৬] মধ্যপ্রাচ্যে যেতে নারী শ্রমিকদের ভিসা ফি ২০০ ডলার এবং পুরুষদের জন্য ৬০০ থেকে ৮০০ ডলার দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আটক হওয়া বা বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে পাচারকৃতরা চুপচাপ থাকে। তাছাড়া উদ্ধার প্রাপ্তের পর নিরাপত্তা হেফাজতে রাখাকালীন সময়েও নারী ও শিশুরা যৌনশোষণের ঝুঁকিতে থাকে। আবার যারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় না তাদের অধিকাংশের স্থান হয় পতিতালয়ে। এভাবে পাচারকৃত এবং অনিয়মিত অভিবাসী শিশুরা যে যৌন শোষণের ঝুঁকিতে থাকে তা দেখানো হয়েছে গ্রন্থটিতে। যারা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত বা শোষিত শিশুদের নিয়ে কাজ করছে এমন মাঠকর্মীদেরকে পাচারের শিকার এবং প্রাক্তন শিশু-যৌনকর্মী ও অন্যান্যদের পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও সমাজে স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে 'কার্যকর অনুশীলন' এর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিতে গ্রন্থটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর ১৯৯৭) বিচারপতি কে.এম সোবহান সম্পাদিত "Rights and Realities" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটিতে নারী ও শিশু অধিকারের বিভিন্ন দিক এবং এর বাস্তব চিত্র পৃথক পৃথক অধ্যায়ে খন্ড খন্ড প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন দমননূলক আইন যেমন- জাতীয় নিরাপত্তা আইন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মানবাধিকার লংঘন, জীবন রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা, কারা আইন, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, কারাগারের বন্দিদশা, সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব, বিশেষ শক্তি আইন ১৯৭৪ (Special Power Act, 1974) এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের চর্চা, নিরপেক্ষ সুশীল সমাজ (Non-Partisan Civil Society) তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অর্থবহ নির্বাচন-এর নিশ্চায়তা, ১৯৯৬ সালের নির্বাচন সহিংসতা এবং বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বাসস্থানের অধিকার বিষয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তি উচ্ছেদ এবং জাতীয় বাসস্থান নীতি ও আন্তর্জাতিক আইন আলোচিত হয়েছে এবং পাচার ও অভিবাসন বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীদের অভিবাসন এর ভয়াবহ পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত অভিবাসন কিংবা পাচার যেভাবেই নারীরা কাজ উপলক্ষ্যে দেশের বাইরে যায় তাদেরকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে, ফলে অর্থনৈতিক কারণে বৈধ অভিবাসন সম্ভব হয়না বলে অনিয়মিত অভিবাসনের আশ্রয় নেয়। এরপর আলোচিত হয়েছে অভিবাসনের পর বিভিন্ন আশ্রয় গ্রহণকারী দেশের প্রতিকূল পরিবেশে অভিবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে। সবশেষে আলোচিত হয়েছে যৌন পর্যটক ও শ্রম অভিবাসনের উদ্দেশ্যে কিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে কোন কোন দেশে নারী ও শিশু পাচার করা হয় এবং পাচার হওয়ার পর বিদেশে তাদের অবস্থা, কাজের প্রকৃতি ইত্যাদি। এছাড়া ফ্যাক্টরীতে শিশু শ্রমের প্রকৃতি, শিশু শ্রম বিষয়ক হারকিনস আইন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিশু অধিকার, শ্রম আইন, শিশু শ্রমের প্রভাব এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুরা কিভাবে শোষিত হচ্ছে এসব বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination) শিরোণামে হিল্লা বিয়ে ও এই সংক্রান্ত মুসলিম পারিবারিক আইন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা হলগুলোতে অবরুদ্ধ নারীদের অবস্থা ও সূর্যাস্ত আইন, সামাজিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও সমঅধিকার প্রাপ্তিতে আইনগত কাঠামো ইত্যাদি বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত হয়েছে। সুতরাং উক্ত গ্রন্থটির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে গ্রন্থটিতে নারী ও শিশুর আইনগত অধিকার ও এর বাস্তব প্রয়োগ-এর মধ্যকার পার্থক্য, সীমাবদ্ধতা এবং নারী ও শিশু পাচারসহ নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মানবাধিকারের প্রেক্ষিতে নারী অধিকারের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ইন্দ্রানী সিনহা (Indrani Sinha) কর্তৃক রচিত "Women's Human Rights", Published by Saga, Calcatta, 1997 গ্রন্থে। এন.জি.ও সহ অন্যান্য ব্যক্তি যারা নারী অধিকার বিষয়ে কাজ করে তাদের জন্য গ্রন্থটির কার্যকরী ভূমিকা বিবেচনা করে লেখক গ্রন্থটিকে একটি ম্যানুয়াল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকারের বিভিন্ন সনদ ও চুক্তি আলোচনা, এর মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন এর দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটিতে মানবাধিকার বিশেষ করে নারী অধিকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পাচার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। কলকাতার স্থানীয় এন.জি.ও সংলাপ এর উদ্ধৃতি দিয়ে পাচারকৃত নারীদের নিয়ে কাজ করে এমন এন.জি.ও কর্মীদেরকে যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাচার প্রতিরোধ, পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন, বাড়ীতে ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মানবাধিকার বিশেষ করে নারী অধিকার এবং নারীর প্রতি বৈষম্য বিষয়টির একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় গ্রন্থটি থেকে। নারী অধিকার লংঘন, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, নারী নির্যাতন এবং সর্বপরি নারী পাচাররোধে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থটিতে। নারী অধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন সংগঠন ও গবেষকদের জন্য গ্রন্থটি দিক নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আই.ও.এম)-এর পরিকল্পনা ও অর্থায়নে স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি) এবং রাইটস্ যশোর-এর সহযোগিতায় রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্স ইউনিট (রামরু)-এর পরিচালনায় "বাংলাদেশ হতে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা সৃষ্টি" (২০০২-২০০৪) প্রকল্পের অধীনে একটি গবেষণা সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত প্রধান দুটি সীমান্তবর্তী এলাকায় (যশোর ও রাজশাহী) জনসাধারণের মাঝে পাচার বিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তম কুমার দাস-এর পরিচালনায় বাংলাদেশ ভারত এবং নেপাল-এর প্রেক্ষাপটে পাচারের উপর "Women Trafficking in South Asia– Legal responses and strategies of selected country" শিরোনামে পি.এইচ.ডি প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর উপর বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান সংঘটিত হলেও ব্যাপক কোন গবেষণা হয়নি।

উপসংহারঃ

গ্রন্থ পর্যালোচনায় দেখা যায় পাচার বিষয়ক অধিকাংশ গবেষণায়ই পাচারের কারণ, ফলাফল, পাচার প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের উপর বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান সংঘটিত হলেও এ সম্পর্কে ব্যাপক কোন গবেষণা এখনও পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কারণ বিভিন্নভাবে পাচার রোধের প্রচেষ্টার পরও যারা পাচার হয় কিংবা পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পূর্বেই যারা পাচার হয়ে গেছে তাদের প্রতি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা

পাচারের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা

পাচারকে অনৈতিক, মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে পাচার প্রতিরোধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি হলেও পাচারের সংজ্ঞা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরণের বিভ্রান্তির। পাচারের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি সবই পরিবর্তিত হয়ে আগের তুলনায় জটিল আকার ধারণ করেছে। পাচারের সাথে এক করে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের অনিয়মিত অভিবাসনকে। ফলে শুরুতেই পাচারের ধারণা সম্পর্কে স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন।

১৯৪৯ সালে গৃহীত পাচার প্রতিরোধ কনভেনশনে পাচারের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তা হলো- জোরপূর্বক অপহরণ করে কোন নিরীহ নারী ও শিশুকে পতিতাবৃত্তির জন্য দেশের ভিতরে বা বাইরে একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করাকে পাচার বলা হয়। এখানে সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে জোরপূর্বক ও অপহরণকে এবং কর্মক্ষেত্র হিসেবে একমাত্র পতিতাবৃত্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৯০-এর দশকে এসে সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় ভিতরে ঢুকেছে নিত্যনতুন কৌশল এবং পাচারকৃত নারী ও শিশুকে নিযুক্ত করা হচ্ছে পতিতাবৃত্তি ছাড়া আরো বিভিন্ন রকম কর্মে। পাচারের এইসব দিককে সমন্বিত করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় ১৯৯৪ সালে একটি এবং আরো পরিমার্জিত করে ২০০০ সালে আরেকটি সংজ্ঞা তৈরী করা হয়।

১৯৯৪ সালে গৃহীত জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী পাচার বলতে প্রধানত: উন্নয়নশীল এবং দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল দেশসমূহের জাতীয় সীমানার বাইরে নিয়োগকারী, পাচারকারী ও অপরাধী চক্রের মুনাফার জন্য নারী ও মেয়ে শিশুদেরকে জোরপূর্বক যৌন অথবা অর্থনৈতিক উৎপীড়নমূলক কর্মকান্ড যেমন: জোরপূর্বক গৃহভৃত্যের কাজ, মিথ্যা বিবাহ, দত্তক এবং গোপন কাজে নিয়োগের জন্য ব্যক্তির অবৈধ ও গোপনীয় স্থানান্তরকে বোঝায়।

২০০০ সালের জাতিসংঘের প্রটোকল অনুযায়ী যেকোন ধরণের শোষণের উদ্দেশ্যে, জোর খাটিয়ে, ধাপ্পা, ছলচাতুরী, ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা পাচারের লক্ষ্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিকে আইন বহির্ভূত উপায়ে টাকা দেওয়া নেয়া করার মাধ্যমে লোক সংগ্রহ, স্থানান্তর, আশ্রয়দান ও অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ ইত্যাদি যেকোন কার্যক্রমকে পাচার বলে গণ্য করা হয়। এখানে শোষণ বলতে বোঝায় পতিতাবৃত্তি এবং অন্যান্য ধরণের যৌন শোষণ, বলপূর্বক শ্রম গ্রহণ, সেবা, দাসত্ব এবং অঙ্গপচারের মাধ্যমে অঙ্গহানী ঘটানো।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংগ্রহ, তাকে গন্তব্যে পৌছাঁনো, বিক্রয় ও ব্যবহার ইত্যাদি যেকোন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছে পাচারকারী।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা- ৫ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ থেকে আনয়ন করে বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করে বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করে বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে বা বিক্রি, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করে, তখন তাকে নারী পাচার বলা যেতে পারে। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা- ৬ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন করে বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করে বা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা ওইরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে বা কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত থেকে চুরি করে তাহলে তাকে শিশু পাচার বলা যাবে।

পাচারের উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের একটা সমন্বিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় প্রফেসর ইসরাত শামীম (১৯৯৭) প্রদত্ত পাচারের সংজ্ঞায়। তার ভাষায়, ''দেশের সীমানার ভিতরে ও বাইরে বিক্রয়, বিনিময় বা অন্য কোন বেআইনী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে যেমন: পতিতাবৃত্তি, বিবাহের নামে দাসত্ব, দাস শ্রম বা নির্যাতনের মাধ্যমে অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বিক্রয়ের জন্য, মনুষ্য অংগ সংগ্রহের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের অপহরণ, অবরুদ্ধকরণ, সংগ্রহকরণ, অপসারণ ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকাণ্ডকেই পাচার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।''

পাচার, অভিবাসন ও মানবচোরাচালান

উপরোল্লিখিত পাচারের সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে পাচার হচ্ছে অনৈতিক কাজের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর। আর অভিবাসন হচ্ছে মানবগোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি বিশেষের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর[৭]। মানব সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানবগোষ্ঠী তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নিজেদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে স্থানান্তর করছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পুঁজি, পন্য ও প্রযুক্তির মতো পৃথিবী জুড়ে শ্রমের চলাচল প্রক্রিয়া সহজ নয়। যেসব দেশে শ্রমিকের প্রয়োজন সেসব দেশের সীমিতকরণ ইমিগ্রেশন নীতি ও অধিকাংশ শ্রমিকের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে বর্তমান সময়ে বৈধ অভিবাসন অনেক কম ঘটছে। তবে বৈধ উপায়ে অভিবাসন কম ঘটলেও মানব চলাচল থেমে

[৭]. রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু) কর্তৃক আয়োজিত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কর্মশালার জন্য প্রণীত মডিউল (২০০২)

Dhaka University Institutional Repository

নেই। তাই অনিয়মিত প্রক্রিয়ায় চলছে মানব চলাচল বা অভিবাসন। অভিবাসনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অভিবাসনকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন -

স্থায়ী বাসিন্দা: যেসকল অভিবাসী, গ্রহণকারী দেশের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা বলা হয়।

শরণার্থী: কোন ব্যক্তি যখন তার নিজ দেশে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সদস্য কিংবা কোন রাজনৈতিক মতবাদের অনুসারী হওয়ার কারণে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে অন্য দেশে বসবাস করার অনুমতি লাভ করে তখন তাকে শরণার্থী বলা হয়।

নিয়মিত অভিবাসী শ্রমিক: যারা দেশত্যাগের অনুমতি পত্র নিয়ে কোন কাজের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি ভিত্তিক বিদেশে যান তাদেরকে নিয়মিত অভিবাসি শ্রমিক বলা হয়।

অনিয়মিত অভিবাসি শ্রমিক: যারা বিদেশে কাজ করার চুক্তিপত্র এবং দেশত্যাগের অনুমতি পত্র না নিয়ে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশে যান তাদেরকে অনিয়মিত অভিবাসী শ্রমিক বলা হয়। এদেরকে অনেকে অবৈধ অভিবাসী শ্রমিক কিংবা নথি বহির্ভূত অভিবাসী শ্রমিক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। বিভিন্ন ধরণের অনিয়মিত অভিবাসন বা মানব চলাচলের মধ্যে রয়েছে অনিয়মিত স্বল্প মেয়াদী শ্রম অভিবাসন, অনিয়মিত দীর্ঘস্থায়ী অভিবাসন, আন্ত:সীমান্ত অনিয়মিত মৌসুমী অভিবাসন, চোরাচালানের জন্য আন্ত:রাষ্ট্রীয় দৈনিক চলাচল এবং নারী ও শিশু পাচার।

অভিবাসন দুই প্রকারে হতে পারে- ১. স্বেচ্ছা অভিবাসন ও ২. বাধ্যতামূলক অভিবাসন। কোন ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় স্থান পরিবর্তন তখন তাকে স্বেচ্ছা অভিবাসন বলে এবং কোনপ্রকার ভয়ভীতির কারণে স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হলে তাকে বাধ্যতামূলক অভিবাসন বলা হয়।

যেহেতু পাচার এক ধরণের স্থানান্তর সেহেতু পাচারকেও এক ধরণের অভিবাসন বলা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার অভিবাসন-এর প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিচারে দেখা যায় যে পাচার এক ধরণের বাধ্যতামূলক অনিয়মিত অভিবাসন। তবে সব ধরণের অনিয়মিত অভিবাসনই পাচার নয়। অনেক সময় অনিয়মিত অভিবাসনের ফলাফল পাচারের ফলাফলের মতোই দু:সহ হওয়ার কারণে অনেকে পাচারকে সকল অনিয়মিত অভিবাসনের সাথে মিলিয়ে ফেলে। প্রকৃত পক্ষে পাচার এবং অভিবাসন তথা অনিয়মিত অভিবাসন এক নয়।

মানবচোরাচালান: পাচারের সাথে অভিবাসনের মতো আরেকটি ধারণাকে মিলিয়ে ফেলা হয় তাহলো মানবচোরাচালান। অনেকে পাচার ও মানবচোরাচালান এবং পাচারকারী ও মানবচোরাচালানকারীকে এক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। সীমান্ত এলাকায় পণ্যের চোরাচালান

Dhaka University Institutional Repository

একটি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার। এই পণ্য চোরাচালান কাজে নিয়জিত ব্যক্তিদের একাংশ পণ্যের ন্যায় মানুষকেও অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পারাপার করায়। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী অনেক ব্যক্তি এই পারাপারের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন কারণে যারা বৈধ উপায়ে দেশের বাইরে নারী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে, চিকিৎসা করতে ইত্যাদি কাজে যেতে সমর্থ হয়না তারা সীমান্ত পার হওয়ার জন্য মানবচোরাচালানকারীর সহায়তা নিয়ে থাকে। তেমনি করে পাচারকারীরাও পাচারের সময় নারী ও শিশুদেরকে সীমান্ত পারাপার করার ক্ষেত্রে মানবচোরাচালানকারীর সাহায্য নেয়। এরা কখনও জেনে শুনে কখনও না জেনে পাচারকারীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এদেরকে সবসময় পাচারকারী বলা ঠিক হবে না। এরা অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য পণ্য ও মানুষের মতোই পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সীমান্ত পার করে দেয়।

প্রত্যাবাসন

বাংলা অভিধানে প্রত্যাবাসন শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া না গেলেও এর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'repatriation' এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবাসন বা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন। পাচারের ক্ষেত্রে যে সকল ভিকটিম দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে অন্যদেশে পাচার হয়েছে তাদের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রত্যাবর্তন হলো প্রত্যাবাসন। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ফিরে আসার ব্যাপারে কোন পছন্দের মূল্য থাকে না কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের অধিকার আছে সেই দেশে থেকে যাওয়ার যদি সে ইচ্ছা করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, নারীদেরও ইচ্ছার কোন মূল্য দেয়া হয় না, এখানে সব সময় নারীর স্বার্থের চাইতে রাষ্ট্রের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

পুনর্বাসন

বাংলা একাডেমী প্রদত্ত অভিধান অনুযায়ী পুনর্বাসন শব্দের শাব্দিক অর্থ স্থায়ী বাসভূমি ত্যাগকারীকে পুনরায় বাসস্থান প্রদান করা। পুনর্বাসনের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'rehabilitation' এর অর্থ শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ-এর মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। পাচারের ফলে নারী ও শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে কোন প্রতিষ্ঠানে রেখে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক পুনরেকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়।

পাচারের পরিসংখ্যান

পাচার বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয় এবং অন্যসব অনৈতিক কাজের মতোই কঠিন আবরণের অন্তরালে পাচারকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। ফলে পাচারের তেমন কোন বস্তুনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক তথ্য পাওয়া যায় না। এ কারণে প্রথম দিককার পাচার বিষয়ক গবেষণায় পাচারের পরিস্থিতি তথা পাচারের পরিসংখ্যানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এসব গবেষণালব্ধ অনুমান ভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আন্তর্জাতিক:

বিভিন্ন দেশের অনুমান ভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, এশীয় দেশগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পাচারের হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী বিশ্বের পাচারকৃতদের দুই-তৃতীয়াংশ আন্ত:এলাকা ভিত্তিক পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে (২ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৮০ হাজার) এবং ইউরোপ ও ইউরেশিয়া (১ লক্ষ ৭০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজার) থেকে পাচার হয়[৮]।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ পাচারের শিকার হয়ে থাকে যার মধ্যে ৫০ হাজারের মতো কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই পাচার হয়। পাচারকৃত ব্যক্তিদের প্রায় ২,২৫,০০০ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং ১,৫০,০০০ দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসে। আর এক তথ্যে প্রকাশ প্রতিবছর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে ১,০০,০০০ এবং আফ্রিকা থেকে ৫০,০০০ নারী, শিশু পাচার হয়ে থাকে।

[উৎস: রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু) কর্তৃক আয়োজিত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কর্মশালার জন্য প্রণীত মডিউল (২০০২)।]

বাংলাদেশ:

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচারের জন্য একটি অন্যতম উৎস রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। এখনও পর্যন্ত পাচার বিষয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। তবে প্রতিদিন এদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

[৮] "Migration in an interconected world: New directions for action", Repoort of the Global Commission on International Migration, October, 2005.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার নারী ও মেয়ে শিশু ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব-আমিরাতে পাচার হয়[৯]। বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে ২ লক্ষ নারী ও মেয়ে শিশু পাকিস্তানে পাচার হয়েছে এবং মাসে এই পাচারের হার ২০০ থেকে ৪০০ জন। ১৯৯৯৪ সালে ২০০০ জন নারী ভারতের ৬ টি বড় শহরের পতিতালয়ে পাচার হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরেও পাচার হয় নারী ও শিশু। ঢাকা শহরে পাচারকৃত যৌনকর্মীদের ৫ হাজার জনের মধ্যে ২ হাজার জনই শিশু।[১০] গোপনে অবৈধ অভিবাসন ও পাচার ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে ১২,৯৫,১৬৫ জন অদক্ষ নারী শ্রমিক অভিবাসী হয়েছে[১১]। দেখা যায় যে এসকল নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই বিদেশের মাটিতে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে বেতন-ভাতা কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না। ফলে অভিবাসন বা স্থানান্তর ইচ্ছাকৃত হলেও পরবর্তীতে প্রতারণার শিকার হওয়ায় তাদেরকে পাচারের শিকার বলা যায়[১২]।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ১৩,২২০ জন শিশু বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৯৮ সালে ১১টি দৈনিক পত্রিকার তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় ১,৩৭৩ জন পাচারের ঘটনা ঘটেছে যাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনের কোন বয়স উল্লেখ করা ছিল না। শিশুরা প্রধানত ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়। ভারত ও পাকিস্তানের পতিতালয়ে যথাক্রমে ২ লক্ষ ও ৩ লক্ষ পাচারকৃত শিশু রয়েছে।[১৩]

আবার জানুয়ারী ২০০০ থেকে জুন ২০০৩ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে শিশু পাচার হয়েছে ৯৬৭ জন, অপহৃত হয়েছে ১০০৯ জন এবং নিখোঁজ হয়েছে ২৪০৫ জন। আর নারী পাচার হয়েছে ২২০ জন এবং অপহৃত হয়েছে ১২৭ জন। নিম্নে লিঙ্গ ভেদে শিশু এবং বয়স ভেদে নারী নিখোঁজ, অপহৃত ও পাচারের একটা চিত্র ছকাকারে তুলে ধরা হলো।

---

[৯] Dr. Ranjana Kumari; Director, CSR, New Delhi; Counter Trafficking in South Asia: SAARC Convention and Way Forward; National Consultation of Stakeholders: Road Map Towards the Implementation of SAARC Convention on Trafficking; 30 November, 2005.

[১০] Statistics on Trafficking and Prostitution in Asia and the Pacific, CATWAP, Greenhillls, San Juan, E-mail: catwap@skyinet.net

[১১] Tasneem Siddiqui, Transending Boundaries – Labour Migration of Women from Bangladesh, UPL, 2001.

[১২] "In International Law, trafficking is defined as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force of other forms of coercion of deception for the purpose of exploitation. According to this definition, human trafficking is independent of victim consent and is a human rights violation", Migration in an interconnected world: New directions for action, Report of the Global Commission on International Migration, October 2005.

[১৩] Second Periodic Report of the Goverment of Bangladesh under the Convention on the rights of the Child Goverment of the Pepoles Republic of Bangladesh, ministry of Women and Children Affairs, December 2000.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ২.১

জানুয়ারী ২০০০- জুন ২০০৩ পর্যন্ত নিখোঁজ, অপহৃত ও পাচারকৃত শিশু (লিঙ্গ ভেদে)

শিশু	নিখোঁজ	অপহৃত	পাচার	সর্বমোট
মেয়ে শিশু	১১৯৬	৭৮৪	৪৫৭	২৪৩৭
ছেলে শিশু	১২০৯	৩২৫	৫১০	২০৪৪
মোট	২৪০৫	১১০৯	৯৬৭	৪৪৮১

সারণি- ২.২

জানুয়ারী ২০০০- জুন ২০০৩ পর্যন্ত নিখোঁজ, অপহৃত ও পাচারকৃত নারী (বয়স ভেদে)

বয়স	১৮-২৫ বছর	২৬-৩৫ বছর	৩৬-৪৫ বছর	৪৬+ বছর	জানা নেই	মোট
অপহৃত	৭২	১৭	৩	১	৩৪	১২৭
পাচার	৫৮	২৩	০	২	১৩৭	২২০
সর্বমোট	১৩০	৪০	৩	৩	১৭১	৩৪৭

[উৎস: প্রফেসর ইসরাত শামীম, "Advocacy campaigns of CWCS to combat Trafficking in Women and Children in the Northern Region of Bangladesh"; National Workshop on-Trafficking in Women and Children Challenges and Strategies, 27 August, 2003]

২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ ''বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা'' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় গত ২০ বছরে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথ দিয়ে ৭ লাখেরও বেশী নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়েছে। এই হিসেবে প্রতিবছর বিদেশে পাচারকৃত নারী ও শিশুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ হাজারে। বিদেশে পাচার হওয়া ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে একই ধরণের উদ্দেশ্যে বহু পাচারের ঘটনা ঘটে যার সঠিক পরিসংখ্যান তেমন পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু পাচারের কারণ

পাচারের ঘটনা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। পাচারের উৎস দেশের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতি, কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রশাসনিক দূর্বলতা, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি এবং গ্রহণকারী দেশের চাহিদার বিভিন্ন দিকগুলো পাচারের কারণ হিসেবে ক্রিয়াশীল। এসব বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে দেখা যায় যে পাচারের কারণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত: দুটি বিষয়। যেমন -

১. উৎস দেশের সমস্যা
২. গ্রহণকারী দেশের চাহিদা

নিম্নে এই দুটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচারের কারণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. উৎস দেশের সমস্যা

উৎস দেশের যে সমস্ত সমস্যা পাচারের কারণ হিসেবে কাজ করে তা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যেমন-

অর্থনৈতিক কারণ:

অনেকেই অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাকে পাচারের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা দূর্বল হওয়ার কারণে সেই দেশটি পাচারের অন্যতম উৎস দেশে পরিণত হয়। বাংলাদেশের শতকরা ৪৮ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। বংশ পরম্পরায় ভূমির বিভাজন এবং আবাদী জমিতে বাসস্থানের ঘর তৈরীর কারণে অনেক পরিবারই নিঃস্ব হয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপন করছে। রাষ্ট্র এদের খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পুরণ করতে পারছে না। ফলে ন্যুনতম মানবিক চাহিদা পুরণ তথা একটু ভালো থাকা-খাওয়ার আশায় কাজের সন্ধানে অভাবী মানুষেরা পাড়ি জমাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে, দেশ থেকে অন্যদেশে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই। এদের এক বিরাট অংশ নারী ও শিশু। আর এসব অসহায় নারী ও শিশুদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় পাচারকারীরা।

কৃষিপ্রধান দেশে চাষযোগ্য জমির অভাবে একটি পরিবার দারিদ্রসীমার চরমে পৌঁছে যায়। কারণ তখন তাদের অকৃষিক্ষেত্রে উপার্জনের জন্য যেটুকু মূলধনের প্রয়োজন তাও থাকে না। এমনকি বর্তমানে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের অধীনেও তাদেরকে আনা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হয় না প্রয়োজনীয় জামানতের অভাবে। এমতাবস্থায় তারা ভবিষৎ ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং বর্তমানে বেঁচে থাকার তাগিদে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও পাচারকারীদের সাথে পা বাড়ায় অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে।

অনেক সময় দেখা যায় চরম অর্থাভাবের কারণে অনেক নিকটাত্মীয় এমনকি বাবা-মা পর্যন্ত তাদের সন্তানকে বিক্রি করে দেয় পাচারকারীদের হাতে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো অভিভাবকরা বুঝতে পারে না যে শিশুটি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের দিয়ে কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হবে। পাচারকারীর সহযোগী লোকজন শিশুদের অভিভাবকদের বোঝায় যে তাদের ছেলে/মেয়ে ভালো খাবে-পরবে, ছোট-খাট কাজ করবে বিনিময়ে অভিভাবকরা টাকা পাবে। পাচারকারী চক্রের এসব চাতুরতাপূর্ণ কথায় আকৃষ্ট হয়ে অর্থভাবে জর্জরিত অভিভাবকরা তাদের প্রিয় সন্তানদের তুলে দেয় পাচারকারীর হাতে এবং পরবর্তীতে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। আবার অনেক সময় কখনই বুঝতে পারে না যে তারা প্রতারিত হচ্ছে কারণ অর্থের অভাবে তারা হয়তো তাদের সন্তানদের নিজেদের কাছে রেখেও নিশ্চিত নিরাপত্তা কিংবা দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করতে পারতেন না।

সামাজিক কারণ:

বিশ্বায়নের ব্যাপক সুফলতাকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে পাচারের এক বিশাল বাজার এবং নেটওয়ার্ক। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারে শিক্ষা ও সচেতনতা কম থাকার কারণে সেখানকার নারী ও শিশুদের প্রতারণা ও পাচার করা সহজ হয়।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার প্রচলন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অধিক তালাক, সন্তানের আধিক্য ইত্যাদি কারণে সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হচ্ছে। সমাজে পরিত্যাক্ত নারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। যৌতুকের শিকার হয়েও জীবনের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হওয়ায় আইনের আশ্রয় নিতে পারে না অনেক পরিবার। ফলে অনেক বাবা-মা সর্বসান্ত হয়ে যৌতুক দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেন। যারা যৌতুক দিতে পারেন না তারা সময়মত মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। আবার অনেক সময় যৌতুক এড়ানোর জন্য বয়স্ক লোকের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে মেয়ের বিয়ে দেন। ফলে অল্প বয়সে মেয়ে বিধবা হয়ে অসহায় হয়ে পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়। কিংবা কোন রকম খোঁজ খবর ছাড়াই হয়তো পাচারকারী বা পাচারের সহযোগীর কাছে মেয়ের বিয়ে দেন, ফলে স্ত্রীর পরিচয়ে পাচারের প্রক্রিয়া সহজ হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের সময় যৌতুক দিতে না পারায় স্বামীর সংসারে যেয়ে নারীকে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় এর পরিণতিতে অনেক সময় বিয়ে বিচ্ছেদ বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এভাবে পরিত্যাক্ত নারীদের অধিকাংশই বাবা-মার কাছে ফিরে আসে এবং দরিদ্র ও বঞ্চনার শিকার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এ অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কাজ পাওয়ার আশায় ঝুঁকি আছে জেনেও অচেনা, অজানা কিংবা স্বল্প পরিচিত কোন লোকের সাথে বেরিয়ে পড়ে এবং পাচারের শিকার হয়।

স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অনেকে পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন স্বামীর সংসারে চলে যায়। তখন তাদের পূর্বের ঘরের সন্তানেরা দাদা-দাদি, নানা-নানি বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের পরিবারে আশ্রিত হিসেবে থেকে যায়। সেখানে তারা প্রয়োজনীয় আদর-যত্ন পায় না এবং বেশীরভাগ আশ্রয়দাতা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অসচ্ছল থাকে বলে তাদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। ফলে তারা পাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। অনেক সময় আশ্রয়দাতা পরিবার ঐসব শিশুদেরকে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দেয়।

গ্রামবহুল এই বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে 'ফতোয়া'র নামে ধর্মের অপব্যবহার নারী ও কিশোরী তথা মেয়ে শিশুদের পাচারের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার এক অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। প্রেম, বিয়ে, তালাক, ধর্ষণ, পরকিয়া, ব্যাভিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অভিযুক্ত করে এধরণের প্রহসনমূলক সালিশী বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকাশ্যে তাদেরকে পাথর ছুড়ে মারা, বেত্রাঘাত করা এবং জরিমানা করা হয়। তাদের পরিবারকে একঘরে করা হয়। মান-সম্মান এবং জীবন বাঁচাতে নারীকে গ্রাম ছাড়তে হয়। মেয়েদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় পাচারকারীরা।

বাংলাদেশের ভেতরে যারা অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করছে তারাও পাচারের ক্ষেত্রে অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদেশে গিয়ে একই ধরণের কাজ করে অনেক বেশী উপার্জন করা সম্ভব বলে পাচারের সহযোগী দালালরা তাদের প্রলুব্ধ করে। যেহেতু তাদের নতুন করে আর হারাবার কিছু নেই সেহেতু তারা জৌলুসপূর্ন জীবনের হাতছানিতে বিদেশের পথে পাবাড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাচার হওয়ার পর এসব নারীরা ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যায় এবং সেখানে তারা মানবেতর অবস্থায়, অনিচ্ছায় ও পূর্বের চেয়ে অনেক কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয়।

প্রেমে ব্যর্থতা, বিয়ে বিচ্ছেদ, পারিবারিক নির্যাতন, পুরুষ শাসিত সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণে সামাজিক ও পারিবারিক চাপে অনেক নারীই Desparate হয়ে যায়। এই শ্রেণীর নারীরা সমাজের অন্যান্য মেয়ের তুলনায় অনেক বেশী সাহসী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তাছাড়া সমাজ থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমানকালের নারীদের মধ্যে এক ধরণের প্রতিবাদী মানসিকতা বা চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। এমতাবস্থায় তারা আত্মনির্ভরশীল হতে যেয়ে সহজেই পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রনৈতিক কারণ:

পাচারের উৎস দেশ যেমন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে নারী ও পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে বিশাল বৈষম্য। এছাড়া আইনে যতটুকু সম্পত্তি পাওয়ার কথা তা থেকেও নারীকে নিরুৎসাহিত ও বঞ্চিত করা হয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়। ফলে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পুরুষের চাইতে দূর্বল থাকে। এমতাবস্থায় যখন কোন নারী কোন স্বাবলম্বী পুরুষের অধীন থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাচারকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। আবার এসব নারীদের সন্তানরাও নিরাপত্তাহীনতার কারণে পাচারের ঝুঁকিতে থাকে।

এদের মতোই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন বিভিন্ন বিহারী ক্যাম্পে অবস্থানকারী উর্দূভাষী জনগোষ্ঠী, রেফ্যুজি ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থীগণ আশ্রয়দাতা দেশের একজন দেশের নাগরিকের চাইতে অনেক কম নাগরিক অধিকার ভোগ করেন। তারা অবস্থানকারী দেশের নাগরিক নন বলে রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন ধরণের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা দানে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়া এদের অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব খারাপ থাকে। ফলে এসব ক্যাম্প থেকে কাজের প্রলোভন, বিয়ে, অপহরণ ইত্যাদি পদ্ধতিতে নারী ও শিশুদেরকে পাচার করা খুব সহজ হয়।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে চাকুরী নিবন্ধীকরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে কাজের উদ্দেশ্যে কোন নারী যখন পাচারের সহযোগী/সংগ্রহকারীর প্রলোভনে ঘর থেকে বের হয়ে আসে তখন সে কোথায়, কোন কাজে, কার সাথে যাচ্ছে তা খুঁজে বের করা দু:সাধ্য হয়ে পড়ে। তাই এই কাজগুলো গোপনে করা সম্ভব হয় এবং পাচারকারীদের ধরা পড়ার ভয় কম থাকে। আর এই সুযোগটা পাচারকারীরা নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে পাচারকারী এবং পাচারের সহযোগীদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে যাবৎজীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মতো কঠিন বিধান রয়েছে। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এত কঠিন দণ্ডে দন্ডিত করার মতো অপরাধ প্রমান করা সম্ভব হয়না। আবার আইনজীবীরা অভিযোগ করেন যে বাংলাদেশে আইনের প্রায়োগিক জটিলতা আছে। মামলা দায়ের করার সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নানারকম পদ্ধতিগত ফাঁক রেখে দেন। ফলে বিচারকার্য শুরু হলে দেখা যায় যে পদ্ধতিগত ভুলের কারণে পাচারকারীরা ছাড়া পেয়ে যায়। এভাবেই আইন থাকলেও আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়না জেনে পাচারকারীরা নির্বিঘ্নে তাদের পাচারকার্য চালিয়ে যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার শিশুর জন্ম নিবন্ধনকে উৎসাহিত করলেও এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা এখনও চালু হয়নি। জন্ম নিবন্ধন না হওয়ায় শিশু সম্পর্কিত কোন রেকর্ড পরিবার বা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের কাছে থাকে না। ফলে অপহৃত হয়ে বা স্বেচ্ছায় কাজের উদ্দেশ্যে পাচারকারী দলের সাথে চলে যাওয়া শিশুটিকে উদ্ধার করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না কিংবা উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তাকে বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। একইভাবে গ্রামের বিয়েগুলো নিবন্ধীকরণের ব্যাপারে স্থানীয় সরকার তেমন তৎপর নয় বলে বিয়ে করে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে নারী ও কিশোরীদের খুব সহজেই পাচার করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে প্রকৃত ঘটনা জানা গেলেও বিয়ে নিবন্ধন না হওয়ায় বরবেশী পাচারকারীকে ধরা সম্ভব হয় না। এই সুযোগটাও পাচারকারী গ্রহণ করে থাকে।

রাষ্ট্র যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে দূর্নীতির মাত্রা ব্যপক আকারে প্রসার লাভ করায় নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে রাষ্ট্র তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। সীমান্ত এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে পাচারকারী চক্রের একটা যোগাযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পাচারকারী চক্রের কাছ থেকে চাঁদা, ঘুষ ইত্যাদি নিয়ে থাকে বলে তাদের কার্যক্রমে কোন বাঁধা সৃষ্টি করে না। আবার পাচার হচ্ছে জেনে কিংবা না জেনে সীমান্ত রক্ষীরা ঘুষ নিয়ে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের নিয়ে পাচারকারীদের সীমান্ত পার করে দেয়। কারণ আমাদের দেশের সামগ্রিক বাস্তবতায় প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ন বেতনভাতা না থাকায় একশ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে প্রশাসনের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাচারকারী চক্র সাহসিকতার সাথে পাচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যক্তিগত কারণ:

ব্যক্তিগত অজ্ঞতা, অসচেতনতা, অশিক্ষা, অর্থনৈতিক দূর্বলতা ইত্যাদি বিষয়গুলো পাচার হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো বিভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি কারণ দ্বারা আবর্তিত হয়।

অশিক্ষিত নারী ও অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা খুব বিশ্বাস প্রবন ও আবেগ প্রবন হয়। তাদেরকে খুব সহজেই প্রতারণার মাধ্যমে পাচার করা সম্ভব হয়। তাছাড়া অনেক সময় সামান্য কারণেই এরা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসে এবং পাচারকারী/সংগ্রহকারীদের কবলে পড়ে যায়।

ব্যক্তিগত অসচেতনতার কারণে অনেক সময় নারী ও শিশুরা পাচার হয়। নারীরা বিশেষ করে কিশোরী মেয়েরা কোন প্রকার ভালো-মন্দ বিচার না করে বা খোঁজ-খবর না নিয়েই প্রেমের ফাঁদে পা দেয় এবং ভবিষ্যৎ এর কথা না ভেবে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বাড়ী ছেড়ে ভালোবাসার মানুষের সাথে পালিয়ে যায়। সেই সুযোগ গ্রহণ করে প্রেমিকরূপী পাচারকারী।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাধুনিকতা ও অতিসচেতনতা কখনও কখনও নারীকে পাচারের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। বর্তমানকালে নারীরা আর পূর্বের মতো অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চায় না। তাছাড়া পুরুষ শাসিত সমাজে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেক নারীকে সাহসী ও প্রতিবাদী করে তোলে। তারা আর গৃহে আবদ্ধ না থেকে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে তারা বিদেশে কাজ করবার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু বাইরের জগতে পা রেখে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অনেক সময় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। নারীর এই অসহায়ত্বের সুযোগ নেয় পাচারকারীরা।

পারিপার্শ্বিক কারণ:

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরো কতগুলো পারিপার্শিক কারণ এবং কিছু সহায়ক শক্তি পাচারের কারণ হিসেবে কাজ করে। যেমন-

ভৌগলিক অবস্থান

বাংলাদেশের মোট ৫,১৩৮ কি.মি. সীমান্ত দৈর্ঘ্যের মধ্যে ৪,১৪৪ কি.মি. ভারতের সাথে এবং ২৮৩ কি.মি. মায়ানমারের সাথে বিস্তৃত। এই বিস্তৃত সীমানার অনেকাংশই অরক্ষিত খোলা সমতলভূমি কিংবা নদী বাহিত। প্রয়োজনের তুলনায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং ক্যাম্প-এর সংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া প্রয়োজনীয় আধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের অভাবে কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে রাতের অন্ধকারে সীমান্তরক্ষীর অগোচরে সীমান্ত এলাকা পায়ে হেঁটে বা নৌকায় পাড়ি দেওয়া সহজেই সম্ভব হয়। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্প-এর দূরত্ব বেশী হওয়ায় এর মাঝে সীমান্ত পারাপারের একাধিক অবৈধ পথ গড়ে উঠেছে।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দূর্যোগের দেশ হিসেবে বিবেচিত। ঘূর্ণিঝড়, অকাল বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি কারণে প্রতিবছর অসংখ্য লোক সম্পদহীন ও ভূমিহীন হয়ে পড়ে। ফলে এসব পরিবারের নারী ও শিশুরা জীবিকার তাগিদে পথে নেমে সহজেই পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

শ্রমের অভিবাসনে ইতিবাচক ফলাফলের প্রভাব

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চল থেকেই নারী ও পুরুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে এবং দেশের বাইরে যাচ্ছে যাদের অনেকেই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছে, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে। অভিবাসনের এই ইতিবাচক ফলাফল দেখে অনেক নারীর মধ্যেই অভিবাসনের ইচ্ছা জাগে। পাচারকারী চক্র এই সুযোগে এসব নারীদেরকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র

বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, অবৈধ পণ্য ও মাদক চোরাচালানকারী, মানব চোরাচালানকারী ইত্যাদি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এসব চক্রের মধ্যে পাচারকারীরাও অবস্থান করছে এবং কেউ কেউ সরাসরি নারী ও শিশু পাচারের সাথে জড়িত। তাছাড়া অভিযোগ আছে যে, এসব চক্রের সাথে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসন কোন না কোনভাবে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা অবাধে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, ফলে নারী ও শিশু পাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

পাচারকৃত নারীর সামাজিক নেটওয়ার্ক

একবার পাচার হয়ে যাওয়া নারীদের অনেকে আবার অধিক লাভের আশায় পাচারকারীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। তারা বিভিন্ন সময়ে দেশে ফিরে এসে নিজেদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও স্বচ্ছলতার লোভ দেখিয়ে অসহায় মেয়েদের প্রলুব্ধ করে বিদেশে পাচার করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়।

পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক

বিশ্বায়নের এই যুগে অল্প পুঁজিতে ব্যাপক লাভজনক একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসা হচ্ছে পাচার। উৎস দেশ, গ্রহণকারী এবং ট্রানজিট এই তিন দেশেই গড়ে উঠেছে পাচারকারীদের এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের অধীনে রয়েছে দেশী বিদেশী পাচারকারী, সংগ্রহকারী, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের সহযোগী গোষ্ঠী। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, বিভিন্ন ধরণের পরিবহন শ্রমিক সবার জন্যই পাচার একটি লাভজনক ব্যবসা। গ্রহণকারী দেশের চাহিদা এবং উৎস দেশের সরবরাহ যতই থাকুক না কেন পাচার এত ভয়াবহ মাত্রায় বৃদ্ধি পেত না, যদি না এই নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতো।

২. গ্রহণকারী দেশের চাহিদা

বাংলাদেশ বা বিভিন্ন উৎস দেশ থেকে নারী ও শিশু পাচার হয়ে ভারত, পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের যে সমস্ত দেশে যায় সেসব দেশ হলো গ্রহণকারী দেশ। গ্রহণকারী দেশের চাহিদা পাচারের কারণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। নিম্নের বিস্তারিত আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও বিশ্ব অর্থনীতিতে এর প্রভাবে বিশ্ব শ্রম বাজারে মহিলা শ্রমিকের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানা, তৈরী পোষাক শিল্প, গৃহকর্মী এবং নার্স এসব ক্ষেত্রে এই চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী দেশে বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তানী মহিলা শ্রমিকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অন্যদিকে এসব উৎস দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে বিপুল সংখ্যক নারী কাজের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। ফলে এখান থেকে নারীদেরকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে নিয়ে যেয়ে পাচার করা সহজ হয়। পাচারকৃতদের কাছ থেকে নেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দেখা যায় যে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া অধিকাংশ নারীকে বিদেশে কাজ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মুক্তবাজার অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যৌন ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই ব্যবসার জন্য অধিক সংখ্যক যৌনকর্মী প্রয়োজন। কিন্তু স্বেচ্ছায় কোন নারীই এই পেশায় আসতে চায় না বলে স্বাভাবিকভাবে এধরণের শ্রমিক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই মিথ্যা প্রলোভন বা অপহরণ অর্থাৎ পাচারের মাধ্যমে এদের সংগ্রহ করে যৌন ব্যবসায়ীদের কাছে সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে যৌন ব্যবসায় প্রসার লাভের সাথে সাথে এইডস্-এর মতো ভয়াবহ মরণব্যধির বিস্তার ঘটেছে। ফলে বাংলাদেশের মতো অপেক্ষাকৃতভাবে এইচ আই ভি মুক্ত দেশের মেয়েদের চাহিদা বেশী এবং তারা পাচারের পক্ষে বেশী ঝুঁকিপূর্ন হয়ে থাকে। বিদেশে ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পতিতালয়ে যৌনকর্মী হিসেবে নিয়োজিত নারী ও মেয়ে শিশুদের অধিকাংশই পাচার হয়ে এসেছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে।

বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে নারী ও শিশু ভারত ও পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়। কারণ এসব দেশে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প রয়েছে যেখানে সেদেশের নাগরিকগণ শারীরিক ক্ষতি হবার আশংকায় কাজ করতে আগ্রহী হয় না কিংবা কাজ করলেও তাদেরকে দ্বিগুন মজুরী দিতে হয়। এই শিল্পগুলো হলো, ভারতের কাঁচ শিল্প, চামড়া শিল্প, পাকিস্তানের কার্পেট শিল্প, বিড়ির ফ্যাক্টরী, তুলা শিল্প ইত্যাদি। এসব শিল্প কারখানায় বিদেশী নারী ও শিশু শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কারণ এদেরকে অনেক কম মজুরীতে কাজ করানো সম্ভব। বিদেশে ছাড়াও আমাদের দেশের অভ্যন্তরে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রমিকের চাহিদা অভ্যন্তরীণ পাচারের কারণ হিসেবে কাজ করে। যেমন দুবলার চর এলাকায় শুটকি তৈরীর কাজে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাচার করে আনা শিশুদেরকে লাগানো হয়। একাজে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় শ্রমিকের অভাব দেখা যায়। অন্যদিকে অপহরণ কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করে আনা শিশুদেরকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করানো যায় বিধায় এখানে শিশু শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে।

বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতির সাথে সাথে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য চাহিদা বেড়েছে। পাচারকারীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাচারকৃত নারী ও শিশুর বিশেষ করে শিশুদের অপহরণ করে বা ভুলিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চড়া মূল্যে বিক্রি করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ অপরাধ প্রমান করা দু:সাধ্য হয়। ফলে পাচারকারীরা নিশ্চিন্তে এধরণের নৃশংস কাজ করে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণকারী দেশের আইন পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পক্ষে কোন কাজ করে না। বরং অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অনিয়মিতভাবে অবস্থানের কারণে গ্রহণকারী দেশের অভিবাসন আইনে পাচারকৃতরা দোষী সাব্যস্ত হয়। যেমন ভারতে নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে এমন কোন আইন নেই যেখানে পাচারকারী শাস্তি পাবে, উপরোন্ত ধরা পড়লে পাচারকৃতরা পাসপোর্ট আইনের আওতায় অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য সর্বোচ্চ তিনমাস কারাভোগ করে এবং জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে। তেমনি করে পাকিস্তানেও হুদুদ আইনের মতো এমন কিছু আইন আছে যাতে করে কোন নারী যদি অভিযোগ করে যে তাকে পাচার করে অবৈধ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে তাহলে হয়তো সে উল্টো নিজে জেনা করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। গ্রহণকারী দেশের এধরণের আইন ও আইনের অপপ্রয়োগ এর সর্বোচ্চ সুযোগ গ্রহণ করে পাচারকারীরা।

সর্বোপরি, যেসব দেশে শ্রমিকের প্রয়োজন সেসব দেশের সীমিতকরণ ইমিগ্রেশন নীতির কারণে বৈধ অভিবাসন কম ঘটছে। গ্রহণকারী দেশে শ্রমিকের চাহিদা আছে এবং উৎস দেশে কর্মসংস্থানের তাগিদ আছে। তাই বৈধ উপায়ে সম্ভব না হলে অবৈধ উপায়ে চলছে শ্রম অভিবাসন। আর এই অবৈধ অভিবাসনের ভিড়ে পাচারকারীরা নির্বিঘ্নে তাদের পাচারকার্য সম্পন্ন করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে পাচারের উল্লেখিত কারণগুলি পরস্পরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এর মধ্যে একটিমাত্র কারণও অনেক সময় একজন ব্যক্তির পাচার হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আবার কখনও দেখা যায় অনেকগুলি কারণের সমন্বয় একজন ব্যক্তিকে পাচারের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। সুতরাং পাচার প্রতিরোধে এমনকি পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও পাচারের উল্লেখিত কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো নির্মূল করতে হবে যাতে করে পাচার প্রতিরোধের সাথে সাথে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতরা যেন পুনরায় পাচারের ঝুঁকিতে না পড়ে যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশু পাচারের পদ্ধতি

পাচার সম্পর্কে সচেতনতা এবং বিশ্ব জনমত যতই বাড়ছে পাচারকারী চক্রও ততই সতর্ক হচ্ছে এবং পাচারের পদ্ধতিতে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা। অপহরণ, মিথ্যা প্রলোভন, প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো বহুদিন ধরেই পাচারকার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত State of Human Rights-এর এক রিপোর্টে পরিলক্ষিত হয় শতকরা ৭৪ জন মহিলা পাচারকারীদের সাথে স্বত:স্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। মিথ্যা প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে ভালো চাকুরীর লোভ দেখিয়ে তাদেরকে বিদেশে পাচার করা হয়। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই জানেনা তাদের সঠিক গন্তব্য কোথায়। আর শতকরা ৫ ভাগ মহিলাকে পাচার করা হয় জোরপূর্বক অপহরণের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু পাচার পদ্ধতিকে দু'টি স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন -

১. পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু সংগ্রহের পদ্ধতি

২. সীমান্ত পারাপারের পদ্ধতি

নিম্নে এগুলো বিস্তারিত আলোচিত হলো।

১. পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু সংগ্রহের পদ্ধতি

পাচারকার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পাচারকারী চক্র প্রথমেই তাদের কিছু দালাল ও সহযোগীর মাধ্যমে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে। তারা নারী ও শিশুদের সংগ্রহ করতে যেয়ে নিম্নরূপ কৌশল ব্যবহার করে থাকে।

কাজের প্রলোভন

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে এখানকার নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তাদের এই মানসিক অবস্থার সুযোগে পাচারকারীরা তাদেরকে বিদেশে ভালো কাজ, ভালো বেতনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রলুব্ধ করে। তাদের কথা বিশ্বাস করে অনেক নারীই ভারত, পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার জন্য রাজী হয়ে যায়।

প্রেমের অভিনয়

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহকারী অনেক সময় কোন নারী বা কিশোরীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরপর সুযোগবুঝে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ঘর থেকে বের করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। অনেক সময় দীর্ঘ মেয়াদী প্রেমের ক্ষেত্রেও এধরণের ঘটনা ঘটে থাকে।

মিথ্যা বিয়ে

পাচারকৃত নারীদের অধিকাংশই আসে দরিদ্র ও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার থেকে। এসব পরিবারে একটু বড় হলেই মেয়েরা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি কারণেও অনেক মেয়ে পরিবারের গলগ্রহ হয়ে পড়ে। এসব সামাজিক চাপে অভিভাবকরা মেয়েদের ভালো বিয়ের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন। পাচারকারী চক্র এসব পরিবারকে ভালো এবং স্বচ্ছল পাত্রের আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যেয়ে পাচার করে দেয়। আবার কখনও সংগ্রহকারী নিজে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিহারী ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সমস্যা বেশী দেখা দেয়। কারণ তাদের অনেক আত্মীয় পাকিস্তানে বাস করে। সেখানে ভালো ঘরে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অনেক নারী সংগ্রহ করে পাচার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাবককে আর্থিক সহায়তা

দরিদ্র ও অধিক সন্তানযুক্ত পরিবার-এর শিশু এবং মাতৃ-পিতৃহীন শিশু যারা অন্যান্য আত্মীয়ের পরিবারে আশ্রিত থাকে তাদেরকে সংগ্রহের জন্য পাচারকারীরা অভিভাবককে আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে পাচারের কৌশলটি ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে পাচারকারী চক্র পরিচিত লোকের মাধ্যমে অভিভাবককে প্রস্তাব পাঠায় যে তাদের সন্তানকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠালে সন্তানরা ভালো থাকবে, ভালো খাবে এবং বিনিময়ে অভিভাবকরা এককালীন কিছু টাকা পাবে ও মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাবে। পাচারকারীর এই আশ্বাসে বিশ্বাস করে অভিভাবকরা অনেক সময় না বুঝেই তাদের সন্তানদের বিক্রি করে দিচ্ছে পাচারকারী চক্রের কাছে।

অপহরণ

অপহরণের মাধ্যমে পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু সংগ্রহ একটি পুরাতন ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। সাধারণত শিশু সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বেশী ব্যবহৃত হয়। চকলেট বা শিশুদের পছন্দ কোন মিষ্টি জাতীয় খাবারে ঔষধ মিশিয়ে শিশুদের খাইয়ে অজ্ঞান করে বা বাক শক্তি রহিত করে পাচারকারীরা তুলে নিয়ে যায়। আবার অনেক সময় জোরপূর্বক ভয়ভীতি দেখিয়ে কিংবা বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেও শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে যায় পাচারকারী চক্র।

শিশু চুরি

সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরির ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। ধারণা করা হচ্ছে পাচারের উদ্দেশ্যে পাচারকারীরা এসব শিশুদেরকে চুরি করে। পাচারকারীর সহযোগীরা হাসপাতালে আসা প্রসূতি বা সন্তান সম্ভবা রোগীদের সাথে সদ্ভাব গড়ে তুলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে। তারপর সুযোগ বুঝে বাচ্চাকে বেড়াতে নেওয়ার নাম করে অথবা অভিভাবকের সামান্য অমনোযোগীতার সুযোগে বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যায়। নির্ভরযোগ্য প্রমান না থাকলেও ধারণা করা হয় মনুষ্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজে এসব নবজাতক শিশুদেরকে ব্যবহার করা হয় কারণ নবজাতক শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুলনামূলকভাবে রোগমুক্ত ও সতেজ থাকে।

ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনের প্রলোভন

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ। পাকিস্তান ও ভারতে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু পূণ্য স্থান রয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বৈধ উপায়ে এসব স্থান পরিদর্শন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাচারকারী চক্র অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসকল ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনের প্রস্তাব দিলে অনেকেই সানন্দে রাজি হয়ে যায় এবং পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকা এবং এর আশে-পাশে অবস্থিত এলাকার দরিদ্র পরিবার থেকে এই পদ্ধতিতে নারী ও শিশু সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া হজ্জ এবং ওমরাহ্ করার নামেও প্রতিবছর বহু নারী ও শিশুকে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পারাপারের পদ্ধতি

বাংলাদেশে পাচারকারীরা স্থলপথে, নৌপথে ও বিমান যোগে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে নারী ও শিশু পাচার করে থাকে। স্থল পথে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সাধারণত পায়ে হেঁটে পার হয়। যেসব সীমান্ত এলাকা নদী দ্বারা চিহ্নিত সেসব সীমান্ত পার হতে নৌকা ব্যবহৃত হয়। যে পথেই সীমান্ত অতিক্রম করা হোক না কেন প্রক্রিয়াটি অবৈধ হওয়ায় পাচারকারীরা সীমান্ত অতিক্রমের জন্য ঘুষ প্রদান, ভুয়া পরিচয় প্রদান ইত্যাদি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। নিম্নে এসব পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচিত হলো।

ধুড় পারাপারের মাধ্যমে

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে চলাচল একটি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার। যশোর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা ইত্যাদি অঞ্চলে যারা পাসপোর্ট ছাড়া সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যায় তাদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় ধুড় বলে আখ্যায়িত করা হয়। এদের মধ্যে মৌসুমী শ্রমিক, ব্যবসায়ী, রোগী, ভ্রমনকারী, ভারতে সামাজিক নেটওয়ার্ক রয়েছে এমন ব্যক্তি, অর্থনৈতিক অভিবাসী, আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারত গমনকারী ইত্যাদি ব্যক্তি রয়েছে। সীমান্ত রক্ষীদের উপস্থিতিতেই এই পারাপার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। নারী ও শিশু পাচারকারীরা ধুড় পারাপারের ছদ্মবেশে তাদের পাচারকার্য সম্পন্ন করে। পাচারকারী চক্র পাচারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত নারী ও শিশুদের ধুড় হিসেবে সীমান্ত অতিক্রমের সময় নিম্নরূপ উপায় অবলম্বন করে।

স্ত্রী পরিচয়ে

স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে নারীদেরকে সীমান্ত পার করা খুব সহজ হয়। আগে থেকে এদেরকে এভাবে শিখিয়ে আনা হয় বিধায় সীমান্ত রক্ষীদের পক্ষে সন্দেহ করা সম্ভব হয় না। আকাশ পথেও মেয়েদেরকে এভাবে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বিদেশে নিয়ে বিক্রি করা কিংবা অবৈধ কাজে নিয়োগ করা হয়।

সন্তান বা আত্মীয় পরিচয়ে

নারীদেরকে যেভাবে স্ত্রী পরিচয়ে সীমান্ত পার করা হয় ঠিক তেমনিভাবে শিশুদেরকেও সন্তান বা ঘনিষ্ট আত্মীয় পরিচয়ে সীমান্ত পার করা হয়। অনেকক্ষেত্রে পাচারকারীরা তাদের পাসপোর্ট-এর মধ্যে শিশুদের নাম লিখিয়ে সন্তান পরিচয়ে বিমানযোগে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যায়। অভিভাবকের পাসপোর্টে শিশু সন্তানদের ছবি সংযোজিত করার নিয়ম না থাকায় এভাবে পাচার করা খুব সহজ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূজা বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নামে

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী শিশুরা ব্যাপক হারে পূজা পার্বনে যোগ দেওয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যায়। সেসময় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত পাহারা শিথিল থাকে। এই শিথিলতা এবং ব্যাপক ভিড়ের সুযোগে পাচারকারীদের পক্ষে পাচারের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের সীমান্ত পার করা সহজ হয়।

পারিবারিক অনুষ্ঠানের নামে

বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলের অনেক পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতে বাস করে। ভারতে অবস্থানকারী আত্মীয়দের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠান-এ যোগ দেওয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দেয়। অনেক সময় পাচারকারীরা এসব অজুহাত দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশুদের সীমান্ত পার করায়।

সীমান্ত রক্ষীদের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে

অনেক সময় আর্থিক লাভের আশায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এক অংশ নারী ও শিশুদের সীমান্ত পার করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়তো সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বুঝতেই পারে না যে তারা সীমান্ত পার করে নারী ও শিশু পাচারে সহায়তা করছে। পাচারকারীরা উপরোল্লিখিত অজুহাত দেখিয়ে সীমান্ত রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে নারী ও শিশুদেরকে সীমান্ত পার করায়।

পাচারের পথ বা রুট

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সীমানা বিশ্লেষণ করে এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের অভিজ্ঞতা ও পাচারকারীদের স্বীকারোক্তি থেকে নারী ও শিশু পাচারের পথ বা রুট চিহ্নিত করা হয়েছে। সামান্য কিছু অংশ মায়ানমার ব্যতিত বাংলাদেশের প্রায় সম্পূর্ন সীমান্ত এলাকা ভারতের সাথে যুক্ত। তাছাড়া দেশ বিভাগের আগে সম্পূর্ন এলাকা একটি রাষ্ট্রের আওতায় ছিল বলে উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছিল অবাধ যাতায়াত যা আজও বিদ্যমান। ফলে অনেক সময় মানবিক কারণে সীমান্ত পাহারা শিথিল থাকে। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাচারকারীরা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে যশোর অথবা রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর সীমান্ত এলাকায় এনে ভারতে পাচার করা হয়। আবার পাচারকারীরা কখনও কখনও সিলেটের জকিগঞ্জ পয়েন্টও ব্যবহার করে থাকে। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশে পাচারের ক্ষেত্রেও বেশীরভাগ সময় ভারতকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নারী ও শিশুদেরকে প্রথমে ভারতে নেওয়া হয়। এছাড়া পাচারকারীরা আকাশ পথও ব্যবহার করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাচারকারীরা প্রধানত: তিনটি পথ ব্যবহার করে পাচারকার্য সম্পন্ন করে থাকে। যেমন-

যশোর অঞ্চলের পথ

বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি থেকে সংগ্রহ করা নারী ও শিশুদের স্থলপথে খুলনা অথবা ফরিদপুর দিয়ে কিংবা জলপথে ঢাকা এনে গাবতলী দিয়ে যশোর নেওয়া হয়। আবার চট্ট-গ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ভোলা এবং পূর্বাঞ্চলের কুমিল্লা ও নোয়াখালী থেকেও গাবতলী হয়ে যশোর আনা হয়। সংগৃহীকৃত এসব নারী ও শিশুদের যশোরের চিত্রা সিনেমার মোড়, মনিহার সিনেমার মোড় এবং যশোর-খুলনা সড়কের মুড়লীর মোড়ে নামিয়ে সেখান থেকে শার্শা, ঝিকরগাছা ও চৌগাছা থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমানার কাছাকাছি একটি স্থানে একত্র করা হয় যাকে যশোরের স্থানীয় ভাষায় ঘাট বলা হয়। ঘাট হতে পারে ধান ক্ষেত, বাড়ী, নদীর পার অথবা মাঠ। এসব ঘাট থেকে ঘাট মালিকদের টাকা দিয়ে নারী ও শিশুদের সীমান্ত পার করে ভারতের সোনাপুর, কৃষ্ণনগর, বাগদহ, বনগাঁ, বারাসাত ইত্যাদি পশ্চিম বঙ্গের এসব এলাকায় এনে জড় করা হয়। সেখান থেকে কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য শহর যেমন দিল্লী, মুম্বাই ইত্যাদি স্থানে পতিতাবৃত্তি বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য নারী ও শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয় বাস বা ট্রেন যোগে।

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের পথ

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ভোলা ইত্যাদি এলাকা থেকে নারী ও শিশুদের সংগ্রহ করে সায়েদাবাদ বা কমলাপুর হয়ে ঢাকার গাবতলী আনা হয়। আবার পূর্বাঞ্চল যেমন কুমিল্লা ও নোয়াখালী থেকেও সরাসরি আগরতলা না নিয়ে গাবতলী আনা হয়। অনেক সময় বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী থেকেও নদী পথে নারী ও শিশুদের ঢাকায় আনা হয়। তারপর ঢাকার গাবতলী থেকে বাস যোগে রাজশাহী অথবা চাঁপাইনবাবগঞ্জ নেওয়া হয়। এরপর রাজশাহীর গোদাগাড়ী ও চারঘাট থানা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ থানার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে সাধারণত: নৌকা যোগে নদী পার হয়ে ভারতের নবীপুর, রানীনগর, চরআষাড়িয়াদহ, ভগবানগোলা, রামনগর, রেনুপাড়া, নবীপুর, দেবীনগর, শোভাপুর, নিমতিতা ইত্যাদি সীমান্তবর্তী এলাকায় আনা হয়। সেখান থেকে নারী ও শিশুদেরকে কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন শহরে পাচার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশ পথ

উপরোক্তভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। এরপর ঢাকার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য বা মালয়েশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় পাচারের উদ্দেশ্যে।

মানচিত্র - ২.১

নারী ও শিশু পাচারের আন্তর্জাতিক পথ

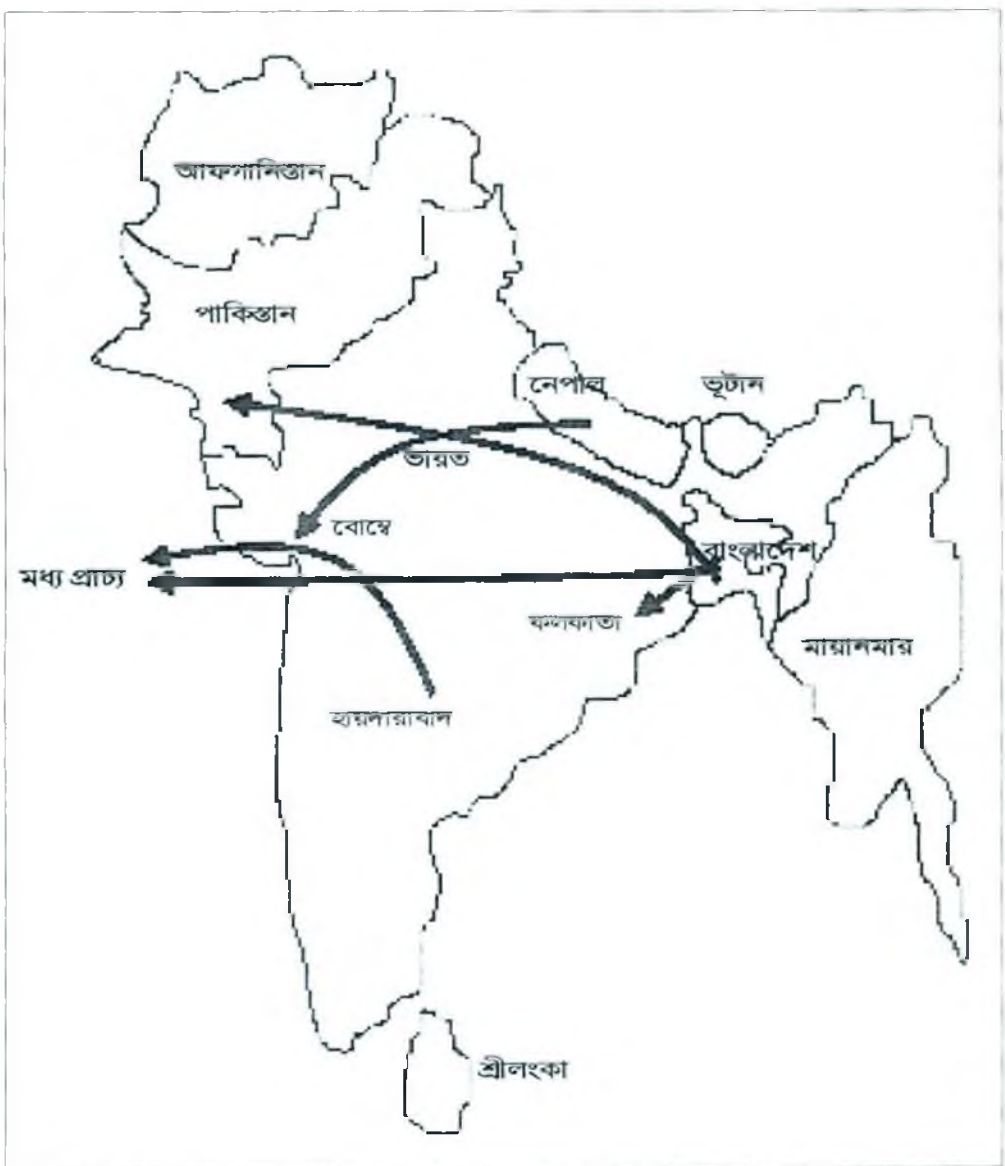

উৎসঃ "Trafficking of Women and Children in Bangladesh: An Overview" সেন্টার ফর হেলথ এন্ড পপুলেশন রিসার্স, আইসিডিডিআরবি।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু পাচারের বাস্তবতা

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের স্থান হয় প্রধানত: ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যেমন- সৌদিআরব, কুয়েত, দুবাই, আবুধাবী, বাহরাইন ইত্যাদি দেশে। এছাড়া চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশেও কিছু নারী পাচার হয়। এসব দেশে পাচার করার পর নারী ও শিশুদের দিয়ে বিভিন্ন ধরণের অনৈতিক ও কষ্টসাধ্য কাজ জোরপূর্বক করানো হয়।

নারী পাচারের বাস্তবতা

সাধারণত: যৌন কর্মে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে নারীদেরকে পাচার করা হয়। ভারতে যৌন বিক্রেতার বৃহৎ বাজার রয়েছে। সেখানে নেপালী মেয়েদের পাশাপাশি বাংলাদেশী মেয়েদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পতিতালয়ে যৌনকর্ম ছাড়াও বিভিন্ন দেশের পর্যটন হোটেলগুলোতে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য পাচারকৃত নারীদের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যৌন ছায়াছবি বা পত্রিকায় এসব নারীদেরকে জোরপূর্বক কাজে লাগানো হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আইনে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ বলে সেখানে লুকিয়ে বাসা বাড়ীতে কেইস ব্রোথেল গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের অনেক মেয়ে পাচার হয়ে এসে বাধ্যতামূলকভাবে পতিতাবৃত্তি করছে। তাছাড়া পাকিস্তানে পাচারকৃত বেশীরভাগ নারীই বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়। বিশেষ করে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পাচারকৃত নারীদের কিনে নিয়ে বিয়ে করে এবং তাদের ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম স্ত্রী হিসেবে উৎপাদন, গৃহকর্ম ও অন্যান্য কষ্টসাধ্য কাজে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। প্রখর রোদে মরু ও পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া চড়ানো, পানি টানা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজ করতে বাধ্য হয়; আবার প্রয়োজনে গৃহকর্তার মনোরঞ্জনেও ব্যবহৃত হয়। যদিও গৃহপরিচারিকা হিসেবে বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মেয়েদেরকে পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আছে তবুও পাকিস্তানের মতো মধ্যপ্রাচ্যেও বাংলাদেশী নারীরা পাচার হচ্ছে এবং প্রতারণার ফাঁদে পড়ে ধর্ষণ ও বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মালয়েশিয়াতেও উদ্বেগজনক হারে পাচার বেড়েছে। গার্মেন্টস কিংবা অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে কাজ দেওয়ার নাম করে নারী ও মেয়ে শিশুদেরকে মালয়েশিয়ায় পাচার করে বাধ্যতামূলক যৌন ব্যবসা করানো হয়।

শিশু পাচারের বাস্তবতা

শিশুদেরকে পাচার করা হয় প্রধানত: তিনটি কাজের উদ্দেশ্যে। প্রথমত: উটের জকি হিসেবে, দ্বিতীয়ত: ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োগের জন্য, তৃতীয়ত: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য। উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য শিশুদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই, সংযুক্ত আরব-আমিরাত,

Dhaka University Institutional Repository

সৌদিআরব, ইত্যাদি দেশে পাচার করা হয়। শিশুদেরকে স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন- কাঁচ শিল্প, চামড়া শিল্প, কার্পেট শিল্প, বিড়ির ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে কাজে নিয়োগের জন্য ভারত ও পাকিস্তানে পাচার করা হয়। এছাড়া মেয়ে শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরণের যৌনকর্মে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যেও পাচার করা হয়। তৃতীয় যে উদ্দেশ্যে শিশুদেরকে পাচার করা হয় তা হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে নৃশংস রূপ- শিশুর হাত পা কেটে, কিডনী বা চোখের কর্নিয়া তুলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। যদিও শিশু পাচার নিয়ে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন বিষয়ে মতানৈক্য আছে তবুও উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশুদের অভিজ্ঞতা এবং ভারতে কিডনী ও অন্যান্য দূর্লভ অঙ্গের সহজ প্রাপ্যতা থেকে এগুলো সরবরাহের একটা গোপন উৎস অনুমানের অবকাশ থেকে যায়। এছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি, চোরাচালান, নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বিক্রয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও শিশুদের পাচার করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে পাচার করা শিশুদেরকেও পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, পকেটমারা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়।

পাচারের ফলাফল

যেহেতু পাচারের প্রক্রিয়া অবৈধ, পাচারের উদ্দেশ্য অনৈতিক সেহেতু পাচারের ফলাফল যে নেতিবাচক হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু সংগ্রহের পর থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট গন্তব্য দেশে পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত, গ্রহণকারী দেশে পৌছানোর পর এবং উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর এই তিন পর্যায়েই পাচারকৃতদের বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এগুলো বিস্তারিত আলোচিত হলো।

শারীরিক ফলাফল

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ হবার পর থেকে গ্রহণকারী দেশে পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত: নারী ও শিশু পাচারের প্রক্রিয়া ও পথ অনেক দীর্ঘ হয় এবং অধিকাংশ সময় পাহাড়ী এলাকা, নদীপথ, মরুভূমি ইত্যাদি এলাকা ব্যবহৃত হয় যেখানে সাধারণ মানুষের চলাচল সচারাচর ঘটে না। দীর্ঘ এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে নারী ও শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন ধরণের দূর্ঘটনার শিকার হতে পারে যেমন- সড়ক দূর্ঘটনা, সাঁতরে নদী পার হওয়ার সময় ডুবে যাওয়া, লুকিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। এছাড়া পাচারের সময় বিভিন্ন স্তরে নারী ও শিশুরা হাতবদল হয়, এই হাতবদলের সময় মেয়েরা পাচারকারী দালাল ও সহযোগী কর্তৃক ধর্ষণ ও অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। আবার সীমান্তে পৌছানোর পর সীমান্ত পারাপারের নিরাপদ সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত নারী ও শিশুদেরকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একাংশের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে হেফাজতে রাখা হয়। হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে অনেক সময় নারীরা সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পর: পাচারের পর গ্রহণকারী দেশে নিয়ে নারী ও শিশুদেরকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যেমন, কাঁচ শিল্প, কার্পেট শিল্প, চামড়া শিল্প ইত্যাদিতে নিয়োগ করা হয়। এসব শিল্পে কাজ করার ফলে তারা শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ, যক্ষ্মা ও অন্যান্য বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে বিনামজুরী বা স্বল্পমজুরীতে কাজ করার জন্য তারা কাজ শেষে স্বাস্থ্যকর আবাসস্থলে বাস করার সুযোগ পায় না। আবার পতিতালয়ে কর্মরত নারী ও কিশোরীদের এইডস্-এ আক্রান্ত হবার ঝুঁকি রয়েছে। অনেক সময় কলকারখানা বা গৃহকর্মে নিয়োজিত পাচারকৃত নারী ও শিশুরা মালিক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। নারী ও কিশোরীরা অনেকেই ধর্ষণের শিকার হয়। অনেকে আবার অকাল গর্ভধারণের সম্মুখীন হয় এবং তাদেরকে জোরপূর্বক গর্ভপাত করানোর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এছাড়া পাচারকৃত শিশুদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘ সময় উটের দৌড়ে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে অপর্যাপ্ত খাবার দেওয়া এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ফলে শিশুরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে এবং ধারণা করা হয় ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিকর ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে প্রতিযোগীতার সময় অনেক শিশু উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়, এমনকি শিশুদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর: পাচার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর পাচারের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়ে নারী ও মেয়ে শিশুদের উপর। তারা কি কারণে ও কিভাবে পাচার হলো, কোথায় ছিল, কি কাজ করেছে সেসব বিষয় যাচাই না করেই সমাজ তাকে কলঙ্কিত, নষ্টা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে কোনঠাসা করে রাখে। সেই সুযোগে অনেক সময় এলাকার প্রভাবশালী, মাস্তান ও উঠতি বয়সের বখাটে পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন এমনকি ধর্ষণের শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে নারীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার যৌনকর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যে পাচারকৃত নারীরা অধিকাংশই এইডস্ কিংবা অন্যান্য যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বিতাড়িত হয়ে দেশে ফিরে আসে এবং মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

মানসিক ফলাফল

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ হবার পর থেকে গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত: পাচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন হাত বদলের এক পর্যায়ে পাচারকৃত নারী ও শিশুরা বুঝতে পারে যে তারা প্রতারণার শিকার হয়েছে, আর তখন থেকেই তাদের মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া পাচারকৃত নারী

Dhaka University Institutional Repository

ও শিশুদের মানসিক শক্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য পাচারকারী ও সহযোগীরা তাদের ভয়ভীতি দেখায়, কটূক্তি এবং মারধোর করে। শুধুমাত্র পাচারকৃত নারী ও শিশুই নয় যে পরিবার থেকে সে অপহৃত হয়ে বা স্বেচ্ছায় পাচারকারীর হাতে পড়ে সেই পরিবারের উপরও একধরণের সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয়। একদিকে সন্তান হারানোর কষ্ট অন্যদিকে সামাজিক চাপ হওয়ায় পাচারকৃতদের পরিবারের সদস্যরাও মানসিক চাপে ভোগেন।

গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পর: গ্রহণকারী দেশে এনে পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানায় কাজ এবং পতিতাবৃত্তিসহ যে সমস্ত অনৈতিক কাজ করানো হয় তার সাথে পাচারের পূর্বে তাদের যে সমস্ত কাজের ধারণা দেওয়া হয়েছিল তার কোন সাদৃশ্য খুঁজে পায় না তারা। ফলে তারা মানসিক চাপে ভুগে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এমনকি আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে তারা। পাচারের সবচাইতে ক্ষতিকর মানসিক প্রভাব পড়ে মেয়ে শিশু ও কিশোরীদের উপর। বিভিন্ন স্তরে যৌন নিপীড়ণের ফলে তাদের মনে একটা স্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং এ কারণে তাদের স্বাভাবিক শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ব্যহত হয়।

উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর: পাচারকৃতদের উদ্ধারের পর বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে ঠিকানা সংগ্রহ করে পরবর্তীতে নিজের পরিবারে হস্তান্তর করা হয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয়ে এবং লজ্জায় পাচারকৃত নারীদেরকে তাদের পরিবার ফিরিয়ে নিতে অনীহা প্রকাশ করে। আবার পরিবার তাকে গ্রহণ করলেও সমাজ তাকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার অপবাদে কলঙ্কিত আখ্যায়িত করে একঘরে করে রাখে। ফলে পরিবার ও সমাজ থেকে উপেক্ষিত হয়ে সে নতুন করে জীবন শুরু করার মতো মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং পুনরায় পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

অর্থনৈতিক ফলাফল

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ হবার পর থেকে গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত: অনেক সময় পাচারকারীরা নারী ও শিশুদের বিদেশে ভালো কাজ দেবে বলে যাতায়াত খরচ হিসেবে তাদের ও অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়। একারণে এসব দরিদ্র পরিবার তাদের সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এছাড়া অপহরণ, মিথ্যা প্রলোভন ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে নারী ও শিশু পাচার করার পর তাদের ফিরে পাবার আশায় অভিভাবকরা খোঁজাখুজি, মামলা করা ইত্যাদি কারণে অর্থ ব্যয় করে আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় কিন্তু কোন সফল হয় না।

গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পর: গন্তব্য দেশে পৌঁছার পর নারী ও শিশুকে বিক্রি করে পাচারকারী চক্রের প্রত্যেকে এবং ক্রয়কারী কারখানা ও পতিতালয়ের মালিক, গৃহকর্তা সবাই বিনা পুঁজিতে

Dhaka University Institutional Repository

লাভবান হয়। ফলে পাচার কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো উৎসাহিত হয় এবং পাচার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে যে দামে কেনা হয় তা তার কাজের পারিশ্রমিক থেকে কেটে নেওয়া হয়। তাছাড়া আইনগত বৈধতা না থাকায় গ্রহণকারী দেশে তাদেরকে একজন নাগরিকের সমপরিমাণ পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়, এমনকি অনেক সময় বিনা পারিশ্রমিকেও কাজ করানো হয়। বিশেষ করে পতিতালয়ে প্রচন্ড পরিশ্রমের বিনিময়ে অত্যন্ত কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আবার দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করে যখন আর তাদের ফিরে আসার উপায় থাকে না তখন তারা তাদের নির্দিষ্ট কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং একসময় তারা তাদের আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। তখন তারা তাদের উপার্জিত অর্থ থেকে দেশেও কিছু পাঠায় যা দেখে অন্যান্য অসহায় নারী ও শিশু প্রলুব্ধ হয়। অনেক সময় দেখা যায় পাচারকৃত এসব নারী ও শিশুরা পরবর্তীতে পাচারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর: উদ্ধারের পর পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বের হয়ে এসে অধিকাংশই আর্থিক সঙ্কটে পতিত হয়ে প্রশিক্ষণকে আর কাজে লাগানোর সুযোগ পায় না। বিভিন্ন পর্যায়ে তার পেছনে পরিবারের অনেক অর্থ ব্যয় হয় এবং সে তখন পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সমাজের চোখে কলঙ্কিত হওয়ায় কর্মক্ষেত্রেও সে বৈষম্যের শিকার হয়।

সামাজিক ও পারিবারিক ফলাফল

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ হবার পর থেকে গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত: কিছু আর্থিক লাভের আশায় দরিদ্র পরিবারের নিকট আত্মীয় এমনকি বাবা-মা পর্যন্ত সন্তানকে পাচারকারীর হাতে তুলে দেয়। সেই থেকে বিভিন্ন স্তরে ক্রয়-বিক্রয় এর মাধ্যমে একজন পাচারকৃত নারী বা শিশু নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে। এভাবে সেই নারী বা শিশু সামাজিকভাবে একটা পণ্যে পরিণত হয়। যেসব নারীরা শিশু সন্তানসহ পাচার হয় তাদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করার পর সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। জানা যায় এসব বিচ্ছিন্ন শিশুদেরকে পাচারকারীদের নিজস্ব আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে বড় করে চড়া দামে বিক্রি করা হয়।

গ্রহণকারী দেশে পৌঁছানোর পর: যেসব কাজের সামাজিক মূল্য বা স্বীকৃতি নেই গ্রহণকারী দেশে সেসমস্ত কাজেই পাচারকৃতদেরকে নিয়োজিত করা হয়। ফলে কোন দেশের সমাজই তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে না। তাছাড়া গ্রহণকারী দেশে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে তারা সে দেশের সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে পারে না। পাচারকৃত নারী শিশুরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে কিংবা পেশা পরিবর্তন করতে না পারে সেজন্য গ্রহণকারী দেশে তাদেরকে সব সময় পাহারায় রাখা হয়, অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়। পাকিস্তানে নারীদেরকে বিয়ের উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

পাচার করা হয়। পাকিস্তানের বিত্তবান গৃহস্থ পরিবারের কর্তারা পাচারকৃত নারীদের তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরের বাইরের সব ধরণের কঠিন কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করিয়ে নেয়। আবার প্রয়োজন হলে তাকে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। ফলে গ্রহণকারী দেশে পরিবারে থেকেও তারা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে থাকে।

উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসার পর: পাচার হবার কারণে পাচারকৃত ব্যক্তির ও তার পরিবারের সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। পাচারকৃতদের পরিবারের সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা বা বিবাহের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়তে অনেকেই কুণ্ঠাবোধ করে। সেই পরিবারটিও লাঞ্ছিত হবার আশংকায় নিজেদেরকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও অন্যের সাথে মেলামেশা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন। আমাদের রক্ষণশীল সমাজে কোন মেয়ের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ঘটনাকে সহজভাবে নেওয়া হয় না। এমনকি যে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সে পাচারকারীর খপ্পরে পড়েছিল, উদ্ধারের পর সেই পরিবারও তাকে সামাজিক চাপের কারণে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। আবার পরিবারে ঠাঁই পেলেও সমাজ তাকে কলঙ্কিত আখ্যায়িত করে একঘরে করে রাখে। ফলে তার পক্ষে আর নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুস্থ জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না।

উপসংহার

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে পাচার একটি অবৈধ স্থানান্তর এবং পাচার হওয়ার পর গ্রহণকারী দেশে পাচারকৃত নারী ও শিশুর বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিভিন্ন অবৈধ ও অনৈতিক কাজে তাদের জোরপূর্বক ব্যবহারের বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। পতিতাবৃত্তিসহ যেকোন অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সাধারণত: কোন স্বাধীন মানুষই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না। ফলে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে অপরাধী চক্র এধরণের কাজে নারী ও শিশুদের নিয়োগের জন্য পাচারের মতো নিকৃষ্ট ও অনৈতিক পথকে বেছে নিয়েছে। এদিকে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের নারী ও শিশুরা ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশায় কিংবা উন্নত জীবনের হাতছানিতে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে ঘর ছাড়ে। কিন্তু এরপর ভালো থাকা তো দূরের কথা বিনা পারিশ্রমিকে কিংবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে তারা বাধ্য হয় অনৈতিক ও ঝুঁকিপূর্ন কাজ করতে। আবার পাচারের পর গন্তব্য দেশে পাচারকৃতরা চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। কারণ ট্রানজিট দেশে অনিয়মিতভাবে প্রবেশকারী হিসেবে এবং গ্রহণকারী দেশে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে অবস্থান করার ফলে পাচারকৃত নারী ও শিশুরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা কিংবা আইনী সহায়তা পায় না। তারা গ্রহণকারী দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তার বাইরে অবস্থান করে। পুলিশের হাতে গ্রেফতার কিংবা হয়রানির শিকার হলেও তারা প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা পায় না, উল্টো শাস্তি পেতে হয় অনেকক্ষেত্রে। যেমন পাকিস্তানে রাষ্ট্র কর্তৃক পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ এবং পতিতাবৃত্তির জন্য কোন

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ে ধরা পড়লে হুদুদ আইনের আওতায় তাকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে[১৪]। ফলে অনেক সময় পাচারকৃত কোন নারী তার প্রতি নির্যাতনের বিচার চাইলে গেলে তাকে পতিতা সাব্যস্ত করে হুদুদ আইনের আওতায় বিচার করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গ্রহণকারী দেশে অবস্থানকালে কিংবা উদ্ধারপ্রাপ্তের পর বিদেশে ও নিজের দেশে সবক্ষেত্রেই তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে থাকে।

[১৪] LHRLA Areas of work Hudood Ordinance, http//www.lhrla.com/hudood.html

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণা কার্যটি সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪৮ জন পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এর জন্য পাওয়া গেছে। এছাড়া দুবাই থেকে ফেরত পাঠানো উটের জকির শিশুদের সাথে অভিভাবক হিসেবে যাওয়া পাচারের সহযোগী ৫ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন এনজিও যারা পাচারকৃত নারী- শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর লক্ষ্যে কাজ করে এদের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত পাচারকৃত এবং কলকাতার বৌবাজার পতিতালয়ে অবস্থানরত বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। যেমন-

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ট্রানজিট হোম)

এখানে ১৫ জন ছেলে শিশু পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে ১৪ জনই দুবাইতে উটের জকি হিসেবে কাজ করতো এবং ১ জন একটু বেশী বয়স (১১ বছর) হওয়ায় তাকে দিয়ে জকির উটের দেখাশোনা করানো হতো। এখানে পাচারকারীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে এমন ৫ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে যারা দুবাইতে উটের জকি হিসেবে কাজ করতে যাওয়া বাচ্চাদের বাবা-মা পরিচয়ে দুবাই গিয়েছিল। এদের মধ্যে মহিলারা উটের মালিকের বাসায় গৃহকর্ম করতো এবং পুরুষ লোকেরা উটের দেখাশোনার কাজ করতো। সম্প্রতি উটের জকি হিসেবে মানব শিশু ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে দু'দেশের সরকারের সহায়তায় উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত শিশুদের সাথে তাদের অভিভাবক হিসেবে যাওয়া এসকল নারী ও পুরুষদেরকেও দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

আহ্ছানিয়া মিশন আশ্রয়কেন্দ্র, যশোর

মিশনের যশোর শাখার আশ্রয়কেন্দ্রে মোট ১০ জন পাচারের শিকার নারী ও শিশুকে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু এবং ৩ জন ছেলে শিশু। ছেলে ৩ জনকেই পাচারের আগে সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে ৩ জনকে সীমান্ত পার হওয়ার আগে উদ্ধার করা হয়, ৩ জন ভারতে যাওয়ার ২/১ দিনের মধ্যেই পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের আশ্রয়কেন্দ্রে ৩/৪ বছর থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়ে অল্প কিছুদিন পূর্বে মিশনের আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছে। অন্যজন অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে ঢাকায় যৌনকর্মী হিসেবে দীর্ঘ

Dhaka University Institutional Repository

৭/৮ বছর কাজ করার পর পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে বেসরকারী সংস্থা 'ইনসিডিন বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে মিশনে এসেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)-এর আশ্রয়কেন্দ্র

উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে ৬ জন পাচারকৃতকে পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে ৫ জন মেয়ে ও ৩ জন ছেলে। ছেলে শিশুটি সৌদিআরবে উটের জকি হিসেবে কাজ করেছে। মেয়েদের মধ্যে ১ জন পাকিস্তানে পাচার হয়ে মালিকের স্ত্রী হিসেবে তার বাড়ীর (ঘরে/বাইরে) সমস্ত কাজ করেছে। ২জন ভারতে পাচার হওয়ার পর পরই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের আশ্রয়কেন্দ্র থেকে এখানে এসেছে। অন্য ২ জন অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে ময়মনসিংহে যৌনকর্ম করেছে, সেখান থেকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে বিএনডব্লিউএলএ-এর আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছে।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট (এসিডি)-এর আশ্রয়কেন্দ্র

এসিডিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য মোট ৬ জনকে পাওয়া গেছে যাদের ৩ জন মেয়ে এবং ৩ জন ছেলে শিশু। ছেলেদের মধ্যে ২ জন ভারতে বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছে, সেখান থেকে পালিয়ে এসে এসিডি-এর কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এখানে এসেছে এবং ১ জন পাচারের পূর্বেই সীমান্ত এলাকায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে ১ জন বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছে, ১ জন বাসা বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করেছে এবং অন্যজনকে সীমান্ত পার হওয়ার আগেই পুলিশ উদ্ধার করেছে।

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি (এসিএসআর)-এর আশ্রয়কেন্দ্র

উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে মোট ৪ জন সাক্ষাৎকার দানকারী মেয়ে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ১জন ভারতে একবছর ঝিয়ের কাজ করেছে এবং ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অন্য ৩ জন (বান্ধবী) বাড়ী থেকে পালিয়ে বেড়াতে যেয়ে সীমান্ত এলাকায় হারিয়ে যায়। পাচার হতে পারে সন্দেহে এক কলেজ ছাত্রী তাদের ধরে থানায় নিয়ে যায়। তবে এসিএসআর-এর আশ্রয়কেন্দ্রে মেয়েদের দায়িত্বে নিয়োজিত সমাজকর্মী দাবী করেন যে মেয়ে তিনজন আসলে পাচারকারীর খপ্পরে পড়েছিল। পাচারকারীর প্ররোচনায় ওরা বাড়ী থেকে বের হয়ে (ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও) আসে এবং সীমান্ত পার হওয়ার সময় সন্দেহ হলে কলেজ ছাত্রীটি ওদের উদ্ধার করে স্থানীয় থানায় নিয়ে আসে। থানা থেকে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মাধ্যমে এখানে আনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

লিলুয়াহোম, কলকাতা, ভারত

কলকাতায় এই সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে মোট ৫ জন বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া মেয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে ২ জন ভারতের পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যৌনকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে, ১ জন গৃহকর্ম করেছে যেখানে সে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ২ জনকে পাচারের ২/১ দিনের মধ্যেই উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়েছে।

বৌবাজার পতিতালয়, কলকাতা, ভারত

বৌবাজার পতিতালয়ে ২ জন নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে যারা বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে এসেছে। এদেরকে এদের স্বামীরা ভারতে পাচার করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। একজন ১৫ বছর এবং একজন ৬ বছর ধরে এখানে যৌনকর্মে নিয়োজিত। এরা এখন আর এখান থেকে ফিরে যেতে চায় না আর এক অনিশ্চিত জীবনে।

প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

আলোচ্য অধ্যায়ে দীর্ঘ ও গভীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ৪৮জন পাচারকৃত নারী ও শিশুর সাধারণ জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঠিকানা বা পাচারের অঞ্চল, পরিবারের মাসিক আয়, আয়ের উৎস ইত্যাদি বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। নিম্নে লেখচিত্রসহ সারণির মাধ্যমে শতকরা হিসেবে উল্লেখিত বিষয়গুলো বর্ণিত হলো।

বয়স ও লিঙ্গভেদে বন্টণ

মোট ২২ জন ছেলে ও ২৬ জন মেয়ের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে অধিকাংশের বয়সই ৯/১০ বছর থেকে ১৫/১৬ বছর পর্যন্ত এবং পাচারকালীন সময়ে এদের বয়স ছিল সর্বনিম্ন ৩ বছর ও সর্বোচ্চ ১২ বছর। মেয়েদের মধ্যে রয়েছে ১৩ বছর থেকে ৪৫ বছরের মহিলা যাদের বয়স পাচারকালীন সময়ে ছিল ৯ বছর থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত। তবে ৯ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়ের সংখ্যা সর্বাধিক (৬৯.২৩%)। নিম্নে সারণির সাহায্যে এই শতকরা হিসাব দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৩.১

বয়সভেদে পাচারকৃত ছেলেদের পরিসংখ্যান

বয়স (পাচারকালীন সময়ে)	সংখ্যা	শতকরা
০ - ৫ বছর	২ জন	৯.০৯%
৫ - ১০ বছর	১৮ জন	৮১.৮১%
১০ - ১২ বছর	২ জন	৯.০৯%
সর্বমোট	২২ জন	১০০%

সারণি - ৩.২

বয়সভেদে পাচারকৃত মেয়েদের পরিসংখ্যান

বয়স (পাচারকালীন সময়ে)	সংখ্যা	শতকরা
৯ - ১৮ বছর	১৮ জন	৬৯.২৩%
১৯ - ২৫ বছর	৫ জন	১৯.২৩%
২৬ - ৩০ বছর	২ জন	৭.৬৯%
৩০ বছরের উর্ধ্বে	১ জন	৩.৮৪%
সর্বমোট	২৬ জন	১০০%

আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সংজ্ঞা অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল মানুষই শিশু[১৫]। যদিও আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণায় ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শিশুকালের সমাপ্তি ঘটে। ফলে বিভিন্ন আইন ও নীতিতে শিশুর সংজ্ঞায় তারতম্য দেখা যায়। যেমন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এবং জাতীয় শিশু নীতিতে শিশু বলতে ১৪ বছরের কম বয়সী যে কোন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে; আবার শিশু আইন ১৯৭৪-এ শিশুর সংজ্ঞায় ১৬ বছরের কম বয়সী যে কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইউনিসেফ এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী ব্যক্তিরা হচ্ছে কিশোর-কিশোরী। সুতরাং বিভিন্ন

[১৫] শিশু অধিকার : জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ; যৌথ প্রকাশনায় - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; আইন ও সালিশ কেন্দ্র; ইউনিসেফ, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ ও নীতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, ১৮ বছরের নীচে কোন ব্যক্তিকে অন্তত নারী কিংবা পুরুষ বলা যাবে না। ফলে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, পাচারকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু (৮৩.৩৩%)। এই তথ্য থেকে প্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের তুলনামূলক চিত্র ৩.৩ নং সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণি - ৩.৩

পাচারকৃতদের সার্বিক পরিসংখ্যান

পাচারকৃত শিশু/নারী		সংখ্যা	শতকরা
শিশু	মেয়ে শিশু	১৮ জন	৩৭.৫০%
	ছেলে শিশু	২২ জন	৪৫.৮৩%
	মোট শিশু	৪০ জন	৮৩.৩৩%
নারী		৮ জন	১৬.৬৬%
সর্বমোট		৪৮ জন	১০০%

বৈবাহিক অবস্থা

পাচারকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই অবিবাহিত/অবিবাহিতা। ২২ জন ছেলের মধ্যে সকলেই অবিবাহিত। ২৬ জন মেয়ের মধ্যে ১৪ জন অবিবাহিতা, ৩ জন বিবাহিতা, ২ জন স্বামী পরিত্যাক্তা, ১ জন বিধবা এবং ৬ জন অন্যান্য অবস্থা। অন্যান্য অবস্থার মধ্যে রয়েছে -

১. বিয়ের দিনই তাকে তার মা তালাক করিয়ে দিয়েছে কারণ ঘটক এক ছেলের কথা বলে অন্য এক বিবাহিত ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছে যা মেয়েটির মা বিয়ের পর পরই জানতে পারে।

২. নিজেই ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছে কারণ স্বামী ছিল মানসিক রোগী এবং সে সুযোগে ভাসুর তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিল।

৩. পিতৃ-মাতৃহীন নানাবাড়ীতে আশ্রিতা মেয়েটিকে মাত্র ৯/১০ বছর বয়সে বৃদ্ধ এক লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছিল মামারা তাই স্বামীকে ভয় পেয়ে বিয়ের দুইদিন পরই শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে।

৪. স্বামী বেড়াতে যাওয়া এবং ঘর বাধাঁর কথা বলে ভারতে নিয়ে এসে পাচার করে পালিয়েছে এমন অবস্থায় আছে ৩ জন।(এদেরকে স্বামী পরিত্যাক্তাও বলা যায়)

নিম্নে ৩.৪ নং সারণির মাধ্যমে পাচারকৃত মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৩.৪

পাচারকৃত মেয়েদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা
অবিবাহিতা	১৪ জন	৫৩.৮৪%
বিবাহিতা	৩ জন	১১.৫৩%
স্বামী পরিত্যাক্তা	২ জন	৭.৬৯%
বিধবা	১ জন	৩.৮৪%
অন্যান্য	৬ জন	২৩.০৭%
সর্বমোট	২৬ জন	১০০%

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পাচারকৃতদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু অশিক্ষিত বা নিরক্ষর এবং সর্বোচ্চ শিক্ষা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত। ৪৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৭ জন নিরক্ষর, শুধুমাত্র স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ৩ জন, প্রাথমিক স্তর-এর ১১ জন এবং মাধ্যমিক স্তরের ৭ জন। অর্থাৎ মোট (২৭+৩) ৩০জন (৬২.৫০%) পাচারকৃতই অশিক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতার এই পরিসংখ্যান ৩.৫ নং সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি - ৩.৫

পাচারকৃতদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	২৭ জন	৫৬.২৫%
স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	৩ জন	৬.২৫%
প্রাথমিক	১১ জন	২২.৯১%
মাধ্যমিক	৭ জন	১৪.৫৮%
উচ্চ মাধ্যমিক	০	০%
স্নাতক	০	০%
স্নাতকোত্তর	০	০%
সর্বমোট	৪৮ জন	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে এদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা বেশ নাজুক এবং পরিবারের মাসিক আয় বেশীরভাগেরই <১০০০ টাকা যা তাদের দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থানকে চিহ্নিত করে। ৭/৮ সদস্যের একটি বৃহৎ পরিবারের আয়কারী সদস্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ১ জন অথবা ২ জন থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রধান আয়কারী সদস্য (পিতা)-এর মৃত্যু কিংবা অনুপস্থিতে মা, অল্প বয়সী বড় ভাই কিংবা নিজেকেই পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। পরিবারের আয়ের উৎসের মধ্যে বেশীরভাগই কৃষিকাজ (৪০%) এবং তার অধিকাংশই অন্যের জমিতে চাষাবাদ (২৮.৩৩%) ও বর্গাচাষ (৩.৩৩%)। খুব অল্প সংখ্যক কৃষক (৮.৩৩%) আছে যারা নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। এছাড়া বাকীরা রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, ট্যাম্পুচালক, ট্রাকচালক, দিনমজুর, ভিক্ষাবৃত্তি, ছোটখাট ব্যবসা (মাছ/তরকারী বিক্রেতা, ভারতীয় কাপড় বিক্রেতা, ঔষধের দোকান), চাকুরী (গার্মেন্টস/বাল্ব ফ্যাক্টরীর শ্রমিক, প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, সিকিউরিটি গার্ড) ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত আছেন। নিম্নে ৩.৬ নং সারণির মাধ্যমে পাচারকৃতদের মাসিক আয় এর পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

সারণি - ৩.৬

পাচারকৃতদের মাসিক আয়

মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা
<১০০০ টাকা	২১ জন	৪৩.৭৫%
১০০০ - ২০০০ টাকা	১৫ জন	৩১.২৫%
২০০০ - ৩০০০ টাকা	৪ জন	৮.৩৩%
৩০০০ - ৪০০০ টাকা	১ জন	২.০৮%
৪০০০ - ৫০০০ টাকা	৫ জন	১০.৪১%
৫০০০ - ৬০০০ টাকা	১ জন	২.০৮%
>৬০০০ টাকা	১ জন	২.০৮%
সর্বমোট	৪৮ জন	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

পাচারকৃতদের কাজের ক্ষেত্র

পাচার হওয়ার পর পাচারকৃতদের বিভিন্ন ধরণের কষ্টকর ও অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। নারী ও মেয়ে শিশুদের বেশীরভাগ যৌনকর্ম ও গৃহভৃত্যের কাজ করতে হয়। আবার অনেক সময় মেয়ে শিশুদেরকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা যেমন- বিড়ির কারখানা, চুড়ির কারখানা ইত্যাদিতে কাজে লাগানো হয়। এছাড়া ছেলে শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় নিয়োগের পাশাপাশি তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে কাজ করানো হয়। আলোচ্য গবেষণায় ৮ জন উত্তরদাতা নারীর মধ্যে ৫ জনকে পাচারের পূর্বেই সীমান্ত এলাকায় কিংবা কোন কাজে দেয়ার পূর্বেই উদ্ধার করা হয়েছে, ২ জন যৌনকর্ম এবং ১ জন গৃহকর্ম করেছে। ৪০ জন শিশুর মধ্যে ১৩ জনকে কাজে দেয়ার পূর্বেই উদ্ধার করা হয়েছে, ১৫ জন উটের জকির কাজ করেছে, ১ জন উটের দেখাশোনার কাজ করেছে, ৫ জন যৌনকর্ম, ২ জন গৃহকর্ম, ৩ জন বিড়ির কারখানায় কাজ (এদের মধ্যে ১ জন মেয়ে শিশু) এবং ১ জন পাকিস্তানে স্ত্রী হিসেবে সেবাদাসীর কাজ করেছে। নিম্নে ৩.৭ নং সারণির সাহায্যে পাচারকৃতের কাজের ক্ষেত্র শতকরা হিসাবে দেখানো হলো।

সারণি - ৩.৭

পাচারকৃতদের কাজের ক্ষেত্র

কাজের ধরণ	নারী		শিশু		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
যৌনকর্ম	২ জন	৪.১৬%	৫ জন	১০.৪১%	৭ জন	১৪.৫৮%
উটের জকি	০ জন	০%	১৫ জন	৩১.২৫%	১৫ জন	৩১.২৫%
উটের দেখাশোনা	০ জন	০%	১ জন	২.০৮%	১ জন	২.০৮%
গৃহকর্ম	১ জন	২.০৮%	২ জন	৪.১৬%	৩ জন	৬.২৫%
শ্রমিক (বিড়ির কারখানা)	০ জন	০%	৩ জন	৬.২৫%	৩ জন	৬.২৫%
স্ত্রী হিসেবে সেবাদাসী	০ জন	০%	১ জন	২.০৮%	১ জন	২.০৮%
কাজে দেয়ার পূর্বেই উদ্ধারপ্রাপ্ত	৫ জন	১০.৪১%	১৩ জন	২৭.০৮%	১৮ জন	৩৭.৫%
সর্বমোট	৮ জন	১৬.৬৬%	৪০ জন	৮৩.৩৩%	৪৮ জন	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

পাচারকৃতদের ঠিকানা বা পাচারের অঞ্চল

উত্তরদাতাদের ঠিকানা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে নয় বরং বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকেই নারী ও শিশু পাচার হয়ে থাকে। তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় তুলনামূলক কিছু বেশী পাচার হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে স্থলপথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যৌনকর্ম ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্যে পাচারকৃতদের অধিকাংশই পাচার হয়েছে যশোরের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর শিবগঞ্জ থেকে। এছাড়া খুলনা, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, নাটোর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। আবার ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে পাচার হওয়া শিশুদের অধিকাংশই পাচার হয়েছে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল যেমন- গাজীপুর, নরসিংদি, মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা ইত্যাদি জেলা থেকে। এছাড়া চাঁদপুর, ভোলা, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চল থেকেও শিশুরা পাচার হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় ৪৮ জন পাচারকৃতের মধ্যে ৪ জন ঢাকা, ২ জন গাজীপুর, ১ জন নারায়নগঞ্জ, ১ জন মানিকগঞ্জ, ২ জন নরসিংদি, ১ জন চাঁদপুর, ৪ জন কুমিল্লা, ১ জন জামালপুর, ১ জন সিলেট, ৫ জন বরিশাল, ৪ জন ভোলা, ৬ জন যশোর, ১ জন নড়াইল, ৬ জন চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং ১ জন করে নাটোর, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট (বৃহত্তর বগুড়া), ময়মনসিংহ, মাদারীপুর (বৃহত্তর ফরিদপুর), পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও খুলনা থেকে পাচার হয়েছে। অন্য ১ জন অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে মনসিংহ পতিতালয়ে কাজ করতো, বর্তমানে মানসিকভাবে অসুস্থ, সে তার ঠিকানা বলতে পারে না। নিম্নের ৩.১ নং মানচিত্রে উত্তরদাতা পাচারকৃতদের পাচারের অঞ্চলসমূহ দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র - ৩.১

বাংলাদেশ থেকে পাচারের উৎস অঞ্চলসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে পাচারকৃতদের মন্তব্য

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন-এর ট্রানজিটহোমে আশ্রয়প্রাপ্ত ১৫ জন পাচারকৃত শিশু (১৪ জন উটের জকির কাজ করতো এবং ১ জন উটের দেখাশোনা করতো) যারা সম্প্রতি দুবাই থেকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাবাসিত হয়েছে এদের মধ্যে ৬ জন বলেছে, ''বুঝি না''। ৫ জন বলেছে, ''এতকিছু বুঝি না, তবে দেশে এসে ভালো লাগছে আর কষ্টের কাজ করতে হবে না, ইচ্ছেমতো খেলাধুলা করতে পারছি এই ভেবে''। ১ জন বলেছে, ''নিজের দেশে এসে বেশী ভালো লাগে, তাই দেশে ফিরিয়ে এনে সরকার ভালো করেছে; পুনর্বাসন কি বুঝি না''। ১ জন বলেছে, ''দেশে এসে ভালো লাগছে, আরো আগে আনলে ভালো হতো, স্কুলে পড়তে পারতাম। এখনও ইচ্ছে আছে বাড়ীতে ফিরে স্কুলে পড়বো। কিন্তু বাবা নেই, মা গরীব মানুষ, কিভাবে পড়াবে? '' ১ জন বলেছে, ''এসব কিছু কিছু বুঝি না। ওদেশেও ভালো লাগতো, কষ্ট হতো না এখন আবার বাড়ীতেও যেতে ইচ্ছে করে''। অন্য ১ জন বলেছে, ''দেশে ফিরে এসে ভালো লাগছে কিন্তু চিন্তা হচ্ছে এখন কি করব, কি খাব? ''

আহ্ছানিয়া মিশনের যশোর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত ১০ জন নারী ও শিশুর মধ্যে ২ জন শিশু যারা সীমান্ত এলাকায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে তারা প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, ''বুঝি না''। সীমান্ত এলাকায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ৪ মাস ধরে আশ্রয়কেন্দ্রে আছে এমন অন্য ৪ জনের মধ্যে ১ জন বলেছে, ''প্রত্যাবাসন বুঝি না। আশ্রয়কেন্দ্রের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ভালো কিন্তু এখানে মন টেকে না। ভুল করে বাড়ী থেকে বের হয়েছি এখন বাড়ী যেতে পারলে বাঁচি''। ১ জন বলেছে, ''যারা পাচার হয়ে বিদেশে গেছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা উচিৎ সরকারের। অন্য দেশে অনেক কষ্ট, নিজের দেশই সবচেয়ে ভালো। আমরা তো কাজের জন্যই বিদেশে যেতে চাই, তাই এখানে যদি কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি সেটাই অনেক ভালো''। ১ জন বলেছে, ''পুলিশ, মেম্বার আংকেল ছিল বলে আমরা পাচার হতে পারিনি ভাগ্য ভালো। সবাই যদি সব সময় এ রকম খেয়াল রাখে তাহলে আর কেউ পাচার হতে পারবে না''। অন্য ১ জন (নিজের ২ মেয়েসহ পাচার হওয়ার সময়ে সীমান্তে উদ্ধারপ্রাপ্ত) বলেছে, ''এত কিছু বুঝি না, তবে খারাপ কিছু হওয়ার আগেই যে ফিরে আসতে পেরেছি তাই আল্লাহর কাছে হাজার শোকর। এখন ভালোয় ভালোয় বাড়ী যেতে পারলে বাঁচি। অভাবের জন্য বাড়ী ছাড়ছিলাম, এখন যদি মেয়েরা এখান থেকে কিছু শিখে কাজ করে খেতে পারে তাহলে খুব ভালো হয়''। অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে ঢাকাতে যৌনকর্মী হিসেবে ৭/৮ বছর কাজ করার পর মানবাধিকার কর্মী কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ৬ মাস ধরে আহ্ছানিয়া মিশনের আশ্রয়কেন্দ্রে আছে এমন ১ জন মেয়ে বলেছে, ''প্রত্যাবাসন বুঝি না। আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব, সম্মানের সাথে থাকতে পারব তাই ভালো লাগছে। আমার মতো সব মেয়েদের এখানে এনে রাখা উচিৎ''। ভারতে পাচার হওয়ার পর পরই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ৩ বছর ভারতের একটি এনজিও (সংলাপ)-এর আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়ে ১ মাস ধরে মিশনের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত ১ জন মেয়ে বলেছে,

Dhaka University Institutional Repository

''বাংলাদেশের অনেক মেয়ে কলকাতার শেল্টারহোমে আছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা উচিৎ। ভারতের সরকার বলেছে যে, বাংলাদেশ থেকে সরকার অর্ডার দিলেই তারা ফিরিয়ে দেবে। এখন বাংলাদেশ সরকারের চেষ্টা চালাতে হবে। পুনর্বাসনের জন্য কলকাতা এবং এখানকার শেল্টারহোম যে সব প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে''। অন্য ১ জন মহিলা যে ভারতে পাচার হওয়ার পর পরই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ২ বছর সংলাপের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়ে ১ মাস যাবৎ মিশনের আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে কিন্তু সে বিশ্বাস করে না যে সে পাচার হয়েছে, তার কথা, ''এসব কিছু বুঝি না। আমি পাচার হইনি, ভারতে বেড়াতে যেয়ে হারিয়ে গেছি। কি দোষ করেছি জানি না। এখন বাচ্চাকে ছেড়ে বছরের পর বছর এখানে সেখানে থাকতে হচ্ছে। আর কতদিন পর বাড়ী যেতে পারব আল্লাহ্ জানে''। ভারতের বোম্বে পাচার হওয়ার ৩/৪ দিন পরই পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ২ বছর বোম্বের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে এবং ২ বছর কলকাতার সংলাপের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়েছে ১ মাস পূর্বে এমন ১ জন মেয়ে বলেছে, ''আমি তো ভুল করে গিয়েছি। পুলিশ ধরেছে, দেশে পাঠিয়েছে। ওরা হয়তো ওদের সময়মতো পাঠিয়েছে কিন্তু আমারতো চার বছর পার হয়ে গেছে। এখন কিভাবে বাড়ীতে যাব, পাড়ার লোকে কি বলবে? কেউতো বিশ্বাস করবে না যে আমি ভালো ছিলাম, ভালো যায়গায় ছিলাম। তাই উদ্ধারের পর প্রত্যাবাসন একটু দ্রুত হওয়া দরকার। আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসন ব্যবস্থা খুব ভালো। এখান থেকে কাজ শিখে বাড়ী যেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব। বোম্বে, কলকাতা এবং এখানকার আন্টিরা খুব ভালো, খুব ভালো ব্যবহার করে''।

এসিডি-এর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত ৬ জনের মধ্যে ২ জন (১ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে) সীমান্তে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদের ১ জন বলেছে, ''পুলিশ, সরকার এবং এনজিওদের উদ্যোগ নিতে হবে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে। তাছাড়া সীমান্ত এলাকায় ভালো পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। পুনর্বাসনের জন্য এসিডি যে কাজ করছে তা খুব ভালো। তবে আমার মনে হয় যারা এখানে আশ্রয় পেয়েছে তাদেরকে ছাড়াও গ্রামে অন্য যে সব ছেলে-মেয়ে পাচারের ঝুঁকিতে আছে তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করা উচিৎ''। অন্য ১ জন যে স্বীকার করে না যে সে পাচার হয়েছে, সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করার পর স্বামী তাকে ভারতে নিয়ে যাচ্ছিল। পাচার করছিল সন্দেহে পুলিশ উদ্ধার করেছে। তার মতে, ''আমি পাচার হইনি। শুধু শুধু এরা সন্দেহ করে আমাকে ধরে এনেছে। পুনর্বাসন সম্পর্কে মন্তব্য হলো- আমি যেন তাড়াতাড়ি বাড়ীতে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারি সেই ব্যবস্থা যেন সবাই তাড়াতাড়ি করে''। ১ জন মেয়ে ভারতে পাচার হয়ে ৩ বছর গৃহকর্ম করেছে পরে মেয়েটির বাড়ী থেকে পুলিশের ভয় দেখালে পাচারকারী নিজেই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, এসিডিতে পাঁচ মাস ধরে আছে, সে বলেছে, ''আমি পাচার হয়েছি, তাই চাই না আর কোন বাচ্চা পাচার হোক। বর্ডারে যেন সব সময় পুলিশ থাকে। যার মাধ্যমে পাচার হবে (পাচারের সহযোগী) তাকে ধরে চাপ দিয়ে সরকার, এনজিও ও সীমান্তরক্ষীরা পাচারকৃতকে ফিরিয়ে আনবে। এখানকার পুনর্বাসন ব্যবস্থা খুব ভালো।

Dhaka University Institutional Repository

আমরাও বড় হয়ে আমাদের মতো যারা ভিকটিম তাদেরকে সাহায্য করব''। ভারতে পাচার হয়ে ১ বছর বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করার পর পালিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে এসে এসিডির আশ্রয়কেন্দ্রে ৫ বছর ধরে আছে এমন ১ জন ছেলে বলেছে, ''দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সমাজের সবার সহযোগীতার দরকার। সবাইতো আমাদের মতো পালিয়ে আসতে পারে না। এখানে অসহায়দের পুনর্বাসনের ভালো ব্যবস্থা আছে। যেমন- আমার কেউ নেই, তাই বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে করে না। এখানে থেকে হেয়ার কাটিং-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা দোকানে কাজ করে দিনে ১০/১২ টাকা যা পাই পোষ্ট অফিসে জমিয়ে রাখি, ভবিষ্যতে নিজেই যাতে সেলুন-এর ব্যবসা করতে পারি''। ভারতে বিড়ির ফ্যাক্টরীতে ৩/৪ মাস কাজ করে পালিয়ে দেশে চলে এসে এসিডিতে ৪ বছর ধরে আশ্রয়প্রাপ্ত ১ জন মেয়ে শিশু বলেছে, ''আমি ভারতে দেখে আসছি অনেক বাচ্চা ওখানে আছে যারা সবাইতো পালাতে পারে না। এক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওদের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ এদের ফিরিয়ে আনতে। বিশেষ করে সরকার সাহায্য করলে এত মানুষ পাচার হতো না। এখানে পুনর্বাসন-এর জন্য অনেক ভালো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এরকম করে আরো এনজিওদের এগিয়ে আসা উচিৎ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছেলে-মেয়ে ছাড়া অন্য জায়গার ছেলে-মেয়েদের জন্যও অন্য স্থানে এরকম আশ্রয়কেন্দ্র খোলা উচিৎ। আগে জানলে সব বাচ্চাদের নিয়ে পালিয়ে আসতাম এখানে''। চার বছর ধরে এসিডিতে আশ্রয়প্রাপ্ত ১ জন ছেলে যে ভারতে বিড়ির ফ্যাক্টরীতে ৬/৭ মাস কাজ করার পর পালিয়ে দেশে ফিরে এসেছে সে বলেছে, ''আমার মনে হয় সরকার এবং এনজিওদেরকে বর্ডার এলাকায় পুলিশ দিয়ে ভারতে সীমান্ত এলাকায় খোঁজ করে বাচ্চাদের উদ্ধার করা উচিৎ। যারা পাচার হয়ে যায় তাদের উদ্ধারের পর মানসিক অবস্থা ভালো করার জন্য শান্তনা দেয়া প্রয়োজন। এখন এসিডি যা করছে ভালো করছে কিন্তু এসিডি তো সবার খোঁজ রাখতে পারবে না। আমার মনেহয় এ ব্যাপারে আরো অন্য এনজিওদের কাজ করা উচিৎ''।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনজাব্লিউএলএ)-এর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত ৬ জন পাচারকৃতের মধ্যে ২ জন মেয়ে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে বলেছে, ''বুঝি না''। এদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে ময়মনসিংহ পতিতালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে যৌনকর্মী হিসেবে ছিল, পরে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে এখানে এসেছে। বর্তমানে সে মানসিকভাবে অসুস্থ, এলোমেলো কথা বলে। অন্য ৪ জনের মধ্যে ১জন ছেলে যে সৌদি আরবে উটের জকি হিসেবে তিন বছর কাজ করার পর বড় হয়ে গেলে পাচারকারীর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলে দেশে ফিরে এলে জেলে ১ মাস থাকার পর বিএনজাব্লিউএলএ উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে। আশ্রয়কেন্দ্রে তিন বছর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে, পড়ালেখা শিখে বর্তমানে সেখানেই ট্রেনিং সেন্টারে বাচ্চাদের শিশু অধিকারের উপর ট্রেনিং দেয়। তার মতে, ''এখানে একজন শিশুর জীবনে চলার জন্য যা যা প্রয়োজন সবই শেখায়, আমার ভালো লাগে''। ১ জন মেয়ে যে পাকিস্তানে পাচার হয়ে সাত বছর স্ত্রী হিসেবে সেবাদাসীর কাজ করার পর পাকিস্তানের এক মানবাধিকার কর্মী কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে বিএনজাব্লিউএলএ-এর সহায়তায় প্রত্যাবাসিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে ৩ বছর প্রশিক্ষণ শেষে বর্তমানে সেখানেই মেয়েদের হাউস সিস্টার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে এবং পরিবারে তাকে ফিরিয়ে নিতে আপত্তি করায় তাকে আজীবন আশ্রয়কেন্দ্রে হাউস সিস্টার হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করেছে। তার কথা, ''মাঝে মাঝে মনেহয় যদি মানিয়ে নিয়ে পাকিস্তানে থাকতে পারতাম সন্তানদের দেখতে পারতাম। এখানে প্রশিক্ষণ কাজে লাগছে, ভবিষ্যতেও কাজ দিবে''। আর ১ জন মেয়ে ভারতের বোম্বে পাচার হওয়ার ২ দিন পরই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে বোম্বের একটা আশ্রয়কেন্দ্রে চার মাস থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়ে ১ বছর এর বেশী সময় ধরে বিএনডাব্লিউএলএ-এর আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে। সে বলেছে, ''প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন খুব দরকারী প্রয়োজন কিন্তু এতদিন শেল্টারহোমে থাকতে ভালো লাগে না। তবে এদের প্রশিক্ষণগুলো ভবিষ্যতে কাজ দেবে''। অন্য ১ জন মেয়ে ভারতে পাচার হওয়ার প্রথম দিনই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের লিলুয়াহোমে ৩ বছর থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়ে বিএনডাব্লিউএলএ এর আশ্রয়কেন্দ্রে ৫ মাস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের সহযোগিতায় বর্তমানে একটা গার্মেন্টসে চাকুরী করছে। তার কথা, ''সরকার থেকে, এই হোম থেকে যদি দেশে ফিরিয়ে না আনতো সারাজীবন অন্য দেশে থাকতে হতো। আবার এরা কাজ শিখিয়েছে, চাকুরী দিয়েছে বলে এখন স্বাধীনভাবে আয় করছি, স্বাবলম্বী হয়েছি''।

এসিএসআর-এর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত ৪ জন মেয়ের মধ্যে ৩ জন মেয়ে পাচারকালীন সময়ে সীমান্তে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে এরা বলেছে, ''প্রত্যাবাসন এর প্রয়োজন হয়নি তাই এ ব্যাপারে তেমন বুঝি না। এখানকার পুনর্বাসন ব্যবস্থা খুব ভালো''। অন্য ১ জন মেয়ে যে ভারতের বোম্বে পাচার হয়ে এক বছর গৃহকর্ম করার পর উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ৭/৮ দিন বোম্বের একটা আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে বিএনডাব্লিউএলএ-এর মাধ্যমে প্রত্যাবাসিত হয়ে ১মাস সেখানকার আশ্রয়কেন্দ্রে থেকেছে। এরপর প্রশিক্ষণের জন্য বিএনডাব্লিউএলএ থেকে এসিএসআর এ পাঠালে ৩ বছর ধরে সেখানে আছে। তার কথা, ''প্রত্যাবাসনে কোন সমস্যা হয়নি, প্লেনে এসেছি। এখানে কাজ শিখিয়ে পুনর্বাসন করাটা খুব ভালো উদ্যোগ''।

ভারতের সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র লিলুয়াহোমে আশ্রয়প্রাপ্ত ৫ জন মেয়ের মধ্যে ১ জন যে পাচার হয়ে দুই বছর পতিতালয়ে থাকার পর উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ মাস ধরে আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে এবং বর্তমানে মানসিকভাবে অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সম্পর্কে বলেছে, ''কিছু বুঝি না''। ১ জন ভারতে পাচার হয়ে পতিতালয়ে বিক্রি হওয়ার সময়ই পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে পাঁচ বছর ধরে লিলুয়াহোমে রয়েছে। সে বলেছে, ''বিপদে পড়ে ভুল করে কাজের সন্ধানে বাড়ীর বের হইছি অন্যকে বিশ্বাস করে। এখন সেই ভুলের মাসুল দিচ্ছি। কিন্তু সরকার যদি আর একটু তাড়াতাড়ি দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতো ভালো হতো। আর এখানে থেকে কিছু কাজ শিখছি। এরপর দেশে গেলে যদি সরকার মেশিন দিয়ে, টাকা দিয়ে সাহায্য করতো তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম। ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে থাকা লাগতো না''।

Dhaka University Institutional Repository

পাচার হয়ে কলকাতার পতিতালয়ে পাঁচ বছর থাকার পর উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে লিলুয়াহোমে আছে দুই বছর ধরে ১ জন মেয়ে। তার মতে, ''এতকিছু বুঝি না। জীবন থেকে এতগুলো বছর চলে গেল। বাড়ী ফিরে গেলে সবাই আমাকে খারাপ বলবে। পালিয়ে বিয়ে করেছিলাম, স্বামীই আমাকে পাচার করল। এতদিন দেশের বাইরে। তবুও বিদেশে আর থাকতে ভালো লাগে না। এখানকার দিদিরা বলে তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠাবে কিন্তু কতদিন হয়ে গেল। আর ভালো না''। আর ১ জন পাচারের ২/৩ দিন পরই সীমান্ত এলাকায় এক বাড়ীতে বন্দি থাকা অবস্থায় পালিয়ে এলে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ৬ বছর ধরে লিলুয়াহোমে আছে। তার কথা, ''মনেহয় কোর্টে রায় হতে আরো কম সময় লাগলে ভালো হয়। এতদিন বিদেশে থাকতে ভালো লাগে না''। অন্য ১ জন পাচার হওয়ার পর এক বছর গৃহকর্ম করার পর উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ৭ বছর ধরে লিলুয়াহোমে আছে। সে বলেছে, ''পাচার হওয়ার সাথে সাথে বা পুলিশ উদ্ধারের পরই যদি দেশে ফেরার ব্যবস্থা হতো তবুও কিছুটা মান-সম্মান থাকতো। এখন এত বছর পর নিঃস্ব অবস্থায় গরীব ঘরে ফিরে যেয়ে কি করব? মানুষ নানান রকম বদনাম দেবে। এখানে পুনর্বাসনের জন্য অনেক কাজ শেখায়। কিন্তু বাড়ী যেয়ে মেশিন কেনার টাকা পাব কোথায়? যা শিখছি সব ভুলে যাব''।

পাচার হওয়ার পর থেকে কলকাতার বৌবাজার পতিতালয়ে যথাক্রমে ৬ বছর ও ১৫ বছর ধরে আছে এমন ২জন মেয়ে যারা আর দেশে ফিরে যেতে চায় না। তাদের ১ জন বলেছে, ''এখানে অনেক বাংলাদেশী অসহায় মেয়ে আছে যারা বাধ্য হয়ে এই পাপ কাজ করছে। আমাদের সরকারের উচিৎ এদেরেকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে নেয়া''। অন্য ১ জন বলেছে, ''দেশে যেয়ে করব কি? স্বামীর কাছে মার খাওয়া, দুই বেলা না খেয়ে থাকা তার চাইতে এখানেই ভালো আছি। কষ্ট হয় শুধু মেয়েদের নিয়ে। ছোট মেয়েটারে এনজিও স্কুলে দিছি। আশা আছে ও লেখা-পড়া শিখে চাকরী করবে। তখন আমরা এই পেশা ছেড়ে এখান থেকে চলে যাব''।

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায় ৪৮ জন উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে ১১ জন পাচারের পূর্বেই সীমান্ত এলাকায়; ৭ জন পাচারের পর পরই ভারতের বিভিন্ন স্টেশন, সীমান্তবর্তী স্থান, পতিতালয় ইত্যাদি এলাকা থেকে পুলিশ অথবা মানবাধিকার কর্মী কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে যাদের মধ্যে দুইজন এখনও ভারতের (কলকাতা) সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র লিলুয়াহোমে রয়েছে। ৩ জন মেয়ে শিশু অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার হয়ে ময়মনসিংহ ও জামালপুর এর বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাচার হয়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহের পতিতালয়ে যৌনকর্মে নিয়োজিত ছিল। অন্যান্যদের মধ্যে দুবাই এ ১৪ জন ছেলে শিশু উটের জকি ও ১ জন উটের দেখাশোনার কাজ করেছে ৪/৫ বছর পর্যন্ত যাদেরকে অতি সম্প্রতি উটের জকি হিসেবে মানব শিশু ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আন্তর্জাতিক

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তির[১৬] ভিত্তিতে উভয় দেশের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া ১ জন ছেলে শিশু সৌদি আরবে উটের জকি হিসেবে কাজ করেছে ৩ বছর, এরপর এনজিও কর্তৃক প্রত্যাবাসিত হয়ে দেশে ফিরেছে। ৪ জন (২ জন নারী ও ২ জন মেয়ে শিশু) ভারতের পতিতালয়ে যৌনকর্মে নিয়োজিত ছিল যাদের মধ্যে দুইজন পালিয়ে এসে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে এখন লিলুয়াহোমে রয়েছে এবং দুইজন এখনও বৌবাজার পতিতালয়ে যৌনকর্মে নিয়োজিত রয়েছে তারা আর দেশে ফিরতে চায় না। ৩ জন (২ জন মেয়ে শিশু ও ১ জন নারী) ভারতে গৃহকর্ম করেছে যাদের একজন এখনও ভারতের লিলুয়াহোমে রয়েছে। ৩ জন (২ জন ছেলে শিশু ও ১ জন মেয়ে শিশু) ভারতে বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছে যারা পালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে দেশে ফিরে এসেছে। অন্য ১ জন মাত্র ১৫ বছর বয়সে পাচার হয়ে পাকিস্তানে স্ত্রী হিসেবে গৃহকর্ম করেছে ৭ বছর যাবৎ, এরপর পাকিস্তানের এক মানবাধিকার কর্মীর সহায়তায় দেশে ফিরে এসেছে। প্রশ্নোত্তর বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পাচারকৃতদের অধিকাংশই নিরক্ষর কিংবা শুধুমাত্র স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন (৬২.৫০%) এবং অতি দরিদ্র পরিবার থেকে (৪৩.৭৫%) এসেছে যাদের পারিবারিক মাসিক আয় <১০০০ টাকা। পাচারকৃত ছেলেদের মধ্যে ১০০ ভাগই অবিবাহিত আর মেয়েদের মধ্যে ৫৩.৮৪% অবিবাহিতা এবং মাত্র ১১.৫৩% মেয়ে বিবাহিতা ও বাকী ১৮.৭৫% মেয়ে স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা ইত্যাদি। এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় তা হলো- মোট পাচারকৃতদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৩৩ ভাগেরই বয়স ১৮ বছরের নিচে এবং ছেলেদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ ও মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬৯.২৩ ভাগের বয়স ১৮ বছরের নিচে। অর্থাৎ নারীদের তুলনায় শিশুরাই বেশী পাচার হয় কিংবা পাচারের ঝুঁকিতে থাকে।

---

[১৬]. ২০০২ সালে আরব আমিরাতে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের উটের জকি হিসেবে ব্যবহার সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভনশন ২৯, ১৩৮ ও ১৮২ অনুযায়ী শিশু পাচার এবং উটের জকি হিসেবে শিশুদের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। তথ্যসূত্র- দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পাচারের বিভিন্ন স্তরে পাচারকৃতের অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পাচারের বিভিন্ন স্তরে পাচারকৃতের অভিজ্ঞতা

সমাজের বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুদেরকে মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহের পর অবৈধ উপায়ে সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে বিদেশে নিয়ে অবৈধ ও অনৈতিক কাজে জোরপূর্বক ব্যবহার করা হয় পাচারকৃত এসব নারী ও শিশুদেরকে। ফলে পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের পাচারের পূর্বে বিভিন্ন সামাজিক/পারিবারিক বঞ্চনা ও পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহের পর থেকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত, পাচারের পর গ্রহণকারী দেশে অবস্থানকালে এবং উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের পর নিজ দেশে ফিরে আসার পর প্রতিটি স্তরেই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত ও বিচিত্র হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষণায় ৪৮ জন পাচারকৃত নারী ও শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে যাদের মধ্যে ৫ জন উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে ভারতের সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র লিলুয়াহোমে ও ৪১ জন বাংলাদেশের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে এবং ২ জন ভারতের বৌবাজার পতিতালয়ে কর্মরত রয়েছে। এসব পাচারকৃতের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে তাদের অভিজ্ঞতা নিম্নে তুলে ধরা হলো। এছাড়া আলোচ্য অধ্যায়ে ৮ জন দুবাই ফেরত পাচারের সহযোগী নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তাদের স্বীকারোক্তি তুলে ধরা হলো।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত অভিজ্ঞতা

পাচারকৃতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এদের অধিকাংশই এসেছে অতি দরিদ্র পরিবার থেকে যাদের অধিকাংশের (৪৩.৭৫%) মাসিক আয় ১০০০ টাকার কম। অভাবের তাড়নায় খেয়ে পরে বেঁচে থাকার তাগিদে অভিভাবকের সম্মতিতে স্বেচ্ছায় ৫৮.৩৩% পাচারকৃত কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশের পথে পাড়ি জমায়। অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কারণে বৈধ পার্সপোর্ট, ভিসা করার সামর্থ তাদের হয় না। তাছাড়া তাদের অধিকাংশই (৬২.৫০%) অশিক্ষিত হওয়ার কারণে পাচারকারীরা তাদের যেভাবে বোঝায় সেভাবেই তারা চলে। পাচারকারীরাও নিজেদের অন্তরালে রাখতে এবং খরচ কমাতে পাচারকৃতদের অবৈধ পথে সীমান্ত পার করানোসহ অব্যবহৃত কিংবা স্বল্প ব্যবহৃত পথে কখনও লোকাল যানবাহন আবার কখনও পায়ে হেটে গন্তব্যে নিয়ে যায়। অনেক সময় সীমান্ত এলাকায় কোন বাড়ীতে পাচারকৃত নারী শিশুদেরকে ২/১ দিন রাখা হয় নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার পূর্বে। তখন সেখানে তাদের মতো আরো অনেককে বন্দি অবস্থায় দেখে তারা তাদের বিপদ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারে এবং তখন থেকেই তাদের মানসিক চাপ শুরু হয়ে যায়। সেখানে বন্দি থাকা অবস্থায় তারা ধর্ষণসহ বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। অনেকে পথিমধ্যে লাঞ্ছনার শিকার হয়, অনেককে ট্রানজিট দেশে জেল খাটতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বক্স নং - ৪.১

কেইস স্ট্যাডি - ১

যশোর জেলার বেনাপোল-এর মেয়ে মিষ্টি (ছদ্মনাম) ৫ ভাই , ২ বোনের মধ্যে ৫ম। খুব ছোটবেলায় রাজমিস্ত্রী বাবা মারা গেলে বড় দুই ভাই অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে অনেক কষ্টে সংসার চালাতো। স্কুল বন্ধ হয়ে যায় মাত্র প্রথম শ্রেণী পড়ার পরই। মিষ্টির যখন মাত্র ১১ বছর বয়স তখন বড় দুই ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে যায়। অন্য পাঁচ ছেলে-মেয়ে নিয়ে মিষ্টির মা খুব অসহায় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রতিবেশী এক মহিলা এসে মিষ্টি ও তার মাকে বললো যে মিষ্টিকে সে সীমান্তের ওপারে কাছেই একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারে যাতে করে মিষ্টিও ভালো থাকবে, পরিবারেও স্বচ্ছলতা আসবে। মিষ্টির মা রাজি হয়ে যায় এবং অনেক কষ্টে এক হাজার টাকা সংগ্রহ করে সেই মহিলার হাতে তুলে দেয় পথ খরচ হিসেবে। তখন মহিলা মিষ্টিকে নিয়ে এসে সীমান্তের কাছে এক গ্রামে তার দূরসম্পর্কীয় (নববিবাহিত) বোনের বাড়ীতে রাত কাটায়। পরদিন কথিত সেই বোন, দুলাভাইসহ মিষ্টিকে নিয়ে মহিলা সীমান্ত পারি দিয়ে কলকাতা থেকে রাতে বোম্বের ট্রেনে উঠে কিন্তু মিষ্টির টিকেট কাটে না। টিটি এসে টিকিট চাইলে দিতে না পারলে তারা মিষ্টিকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে আর বলে টিকেট দিতে না পারলে তারা মিষ্টিকে ধর্ষণ করবে। তখন গোলমাল শুনে এক ভদ্রলোক (যাত্রী) এগিয়ে এসে টাকা দিয়ে মিষ্টিকে টিটিদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনে। পরদিন বোম্বে পৌঁছে মহিলা তার বাসায় সবাইকে নিয়ে উঠায়। সেদিন বিশ্রাম নিয়ে পরেরদিন মিষ্টিকে মার্কেটে নিয়ে যেয়ে সুন্দর সুন্দর সংক্ষিপ্ত পোশাক কিনে দেয়, সন্ধায় সেগুলো পরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যায় এক হোটেলে যেখানে অনেক মেয়ে নাচছে। মিষ্টিকেও সবাই নাচতে বলে কিন্তু মিষ্টি নাচতে পারে না, তার খুব ঘুম পাচ্ছিল। তখন হোটেল মালিক ও সেই মহিলা তাকে খুব গালমন্দ করে বাসায় নিয়ে আসে। রাতে মহিলার সেই কথিত বোনকে এক ঘরে আটকে সেখানে কিছু লোক পাঠিয়ে দেয় আর মিষ্টিকে অন্য ঘরে রেখে সেই বোনের স্বামীসহ আরো দুই জন লোককে তার ঘরে পাঠায়। লোক গুলো নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিল, এক জন মিষ্টিকে জাপটে ধরলে মিষ্টি তাকে ঠেলে ফেলে দৌড়ে অন্যঘরে যেয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। সকাল বেলা মহিলা তাকে খুব মারধোর করে, কিছুক্ষণ পর মিষ্টির ব্লিডিং শুরু হয় মিষ্টি ভয় পেয়ে কান্না শুরু করলে সেই লোকগুলো ও মহিলা হাসাহাসি করে, পরে বুঝতে পারে এটা ছিল তার প্রথম পিরিয়ড। দুইদিন পর এক সুযোগে সে সেখান থেকে পালিয়ে এসে রাস্তায় এক মহিলার কাছে আশ্রয় চাইলে সে তার বাসায় নিয়ে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়। সেখানে সে প্রায় এক বছর কাজ করেছে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই ঐ বাসার দুই ছেলে পর্যায়ক্রমে মিষ্টিকে ধর্ষণ করে এবং তারা নিয়মিত মিষ্টিকে লাঞ্ছিত করা শুরু করে। তখন একদিন সেখান থেকেও সে পালিয়ে এসে ট্রেনে চড়ে অজানা এক স্থানে চলে আসে। স্টেশনে কাঁদতে দেখে এক মহিলা তাকে নিয়ে এসে স্থানীয় এক আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে আসে। সেখানে ৭/৮ দিন থাকার পর বাংলাদেশের বিএনডাব্লিউএলএ-এর মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখে। ১ মাস পর মিষ্টিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলে গ্রামের লোকের সমালোচনা এড়াতে এবং মিষ্টির নিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর লক্ষ্যে মিষ্টির মা আবার মেয়েকে নিয়ে আসে ঢাকায় বিএনডাব্লিউএলএ-এর অফিসে। ওরা তখন পুনর্বাসনের জন্য মিষ্টিকে এসিএসআর-এর আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়, মিষ্টি বর্তমানে এখানেই আছে।

Dhaka University Institutional Repository

বক্স নং - ৪.২

কেইস স্ট্যাডি - ২

জয়পুরহাট (বগুড়া) এর এক হাসপাতালে জন্ম হওয়ার পর সেখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায় আঁখির (ছদ্মনাম) মা। তখন ওখানকার এক ডাক্তার আখিকে নিয়ে এসে লালন-পালন করেন। কিন্তু ডাক্তারের ছেলে-মেয়েরা আখিকে সহ্য করতে পারতো না, মারধোর করতো। আখির যখন ৭/৮ বছর বয়স তখন একদিন ডাক্তারের এক ছেলে তাকে ধর্ষণ করে। ভয়ে আখি পালিয়ে ডাক্তারের বাড়ীতে কাজ করতো যে মহিলা তার বাসায় যেয়ে উঠে। দুইদিন পর সেই মহিলার স্বামী আখিকে আবার বুঝিয়ে ডাক্তারের বাড়ীতে নিয়ে যায় রেখে আসার জন্য। তখন ডাক্তার ও তার ছেলে-মেয়েরা জোর করে সেই লোকের সাথে আখির বিয়ে দিয়ে দেয়, আঁখিকে নিয়ে সে আবার ফিরে আসে। আঁখি, তার সতিন, স্বামী কেউই এই বিয়েটা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। ১২ বছর বয়সে আঁখির একটা মেয়ে জন্ম হয় তবুও তার সংসারে মন বসে না, ছুটে ছুটে চলে আসে ডাক্তারের বাড়ী। একসময় ডাক্তার মারা গেলে তার বাড়ীর সবাই খুব নির্যাতন করে আখিকে। তখন প্রতিবেশী এক মহিলার কাছে আঁখি তার দুঃখের কথা বললে সে তাকে পাকিস্তানে খুব ভালো কাজ দেওয়ার কথা বলে। আখিও পালিয়ে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পেয়ে মহিলার কথায় রাজি হয়ে যায়। ৭/৮ মাস বয়সী মেয়েকে স্বামী ও সতিনের কাছে রেখে কাউকে না জানিয়ে সেই মহিলার পরিচিত এক লোকের সাথে রওনা দেয় পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে। প্রথমে লালমনিরহাটে সীমান্তের কাছে এক বাড়ীতে এনে উঠায় যেখানে তার মতো আরো ১৫/১৬ জন মেয়ে ও ১৫/১৬ জন ছেলে রয়েছে এবং আর একজন লোক ছিল তাদের সাথে যাওয়ার জন্য। সবাইকে নিয়ে রাতের বেলা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের এক গ্রামে এক বাসায় উঠে। পরদিন রাতে কলকাতা থেকে ট্রেনে উঠলে পুলিশ ধরে নিয়ে থানায় আটকে রাখে। এক সপ্তাহ জেলে থাকার পর পাচারকারীরা তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর আরো কয়েকদিন ভারতে অবস্থান করে ট্রেন, বাস, পায়ে হেঁটে প্রচন্ড কষ্ট করে পাকিস্তানে পৌঁছাতে প্রায় এক মাস সময় লেগেছে সব মিলিয়ে। পাকিস্তানে নিয়ে সবাইকে একটা বাসায় উঠায় এবং এক এক করে সবাইকে বিভিন্ন কাজে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আখিকে সেই পাচারকারী ধর্ষণ করে এবং ২০ দিন পর এক আমীরের সাথে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় তার বাড়ী। লোকটির আরো দুইজন স্ত্রী ছিল, প্রথম জন সংসার চালাতো আর দ্বিতীয় জন এবং আঁখিকে দিয়ে ঘরের সব কাজ ও ক্ষেতে কৃষিকাজ করাতো। সারাদিন অনেক কাজ করতো তারপরও স্বামী ও বড় সতিন দুর্ব্যবহার করতো। ৭ বছর আখি সেখানে থাকে, তার ৩ ছেলের জন্ম হয়। এরপর একদিন ছেলে তিনটাকে রেখে আঁখির স্বামী তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে অন্য এক বড়লোকের বাসায় কাজে লাগিয়ে দেয় যেখানে সে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতো। সেখানে এক বাংলাদেশী মহিলার সাথে পরিচয় হলে তাকে সে তার কষ্টের কথা বলে বাংলাদেশে ফিরে আসতে চায়। তখন উনি এক সমাজকর্মী মহিলার সাথে আখির দেখা করিয়ে দিলে সে আখিকে উদ্ধার করে তার বাসায় রেখে বাংলাদেশে বিএনডাব্লিউএলএ-এর সাথে যোগাযোগ করে। বিএনডাব্লিউএলএ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আখিকে দেশে ফিরিয়ে আনে এবং তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় দেয়। এরপর বিএনডাব্লিউএলএ-এর আশ্রয়কেন্দ্রে আঁখিকে সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ শেখানো হয় এবং পরিবারে পুনরেকত্রীকরণ-এর জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। পাকিস্তানে বিয়ের কথা লুকিয়ে প্রথম স্বামীর সাথে যোগাযোগ করা হলে সে আর আঁখিকে ফিরিয়ে নিতে চায় না। তখন পাকিস্তানে তিন ছেলের কথা মনে করে আঁখি আবার সেখানে ফিরে যেতে চায় কিন্তু পাকিস্তানে তার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করা হলে সে আঁখিকে মেনে নিতে রাজি হয় না। এরপর ডাক্তারের ছেলেদের বললে তারাও রাজি হয় না আঁখিকে আশ্রয় দিতে। শেষ পর্যন্ত দেড় বছর আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পর আঁখির ইচ্ছেতে জয়পুরহাটে তার এক প্রতিবেশীর কাছে পাঠানো হয়। একমাস সেখানে থাকার পর একদিন আঁখি গণ-ধর্ষণের শিকার হয়। দৈনিক পত্রিকায় এই সংবাদ দেখে বিএনডাব্লিউএলএ আবার আঁখিকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং আজীবন থাকার ব্যবস্থা হিসেবে এখানকার মেয়েদের দেখাশোনার জন্য তাকে হাউস সিসটার হিসেবে নিয়োগ দেয়।

গ্রহণকারী দেশে অবস্থানকালে অভিজ্ঞতা

পাচারের পর গ্রহণকারী দেশে পৌছানোর পর পাচারকৃতদের শুরু হয় নতুন এক তিক্ত অভিজ্ঞতার। পাচারের পূর্বে তাদেরকে যে সমস্ত কাজের প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল তার সাথে বিদেশে এনে দেওয়া কাজের কোন মিল খুঁজে না পেয়ে তারা প্রথমেই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর বাধ্য হয়ে উটের জকি, ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানায় কাজ, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি কাজ করার ফলে কিছুদিনের মধ্যে তারা শারীরিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অল্প বয়সে উটের জকির মতো কঠিন কাজ করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রনে কম খাদ্য সরবরাহ ও ক্ষতিকর ঔষধ প্রয়োগের ফলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। আলোচ্য গবেষণায় দুবাই এ উটের জকি হিসেবে কাজ করা উত্তরদাতাদের প্রত্যেকেরই বয়সের তুলনায় শারীরিক বৃদ্ধি অনেক কম ছিল এবং মানসিক দিক থেকেও তারা তুলনামুলকভাবে অপরিণত ছিল। অনেক সময় উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে শিশুরা পঙ্গু হয়ে যায়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

আবার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানা যেমন- বিড়ির ফ্যাক্টরী, কাঁচ শিল্প, কার্পেট শিল্প, চামড়া শিল্প ইত্যাদিতে কাজ করার ফলে শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগসহ বিভিন্ন ধরণের বক্ষব্যধি এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। উত্তরদাতাদের মধ্যে কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে শিশুকে পাওয়া গেছে যারা পাচার হয়ে ভারতে বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছে যাদের অভিজ্ঞতা হলো - ভোর ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করায়, এক হাজারটা বিড়ি বানাতে না পারলে ভাত দেয় না, রাতের বেলা এক ঘরে গাদাগাদি করে অনেক ছেলে-মেয়েকে একত্রে ঘুমাতে দেয়, বাড়তি কোন পারিশ্রমিক দেয় না। অনেককে আবার ফ্যাক্টরীর কাজের ফাঁকে মালিকের ঘরের অন্যান্য কাজ, ক্ষেত থেকে শষ্য বোঝাই করে ঘরে তোলা ইত্যাদি ধরণের কাজও করতে হয়।

যে সমস্ত নারী ও শিশুরা বাসা বাড়ীতে গৃহকর্ম করে তারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এমনকি বাড়ীর পুরুষ সদস্য কর্তৃক ধর্ষণ-এর শিকার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সবচাইতে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় সে সমস্ত নারী ও মেয়ে শিশুদের যারা বাধ্য হয় পতিতাবৃত্তি করতে। একবার এই অন্ধকার জগতে পা দিলে এর থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে তাদেরকে কড়া পাহাড়ায় রাখা হয়, ইচ্ছের বিরুদ্ধে, মনের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক এই অনৈতিক কাজ করানো হয় কিন্তু বিনিময়ে থাকা-খাওয়া ছাড়া বাড়তি কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। পরবর্তীতে অনেকদিন থাকার ফলে তাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রন নিজেদের আয়ত্তে এলে এবং এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর তারা সেখান থেকে ফিরতে চায় না। কারণ এদের অধিকাংশই মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে বিয়ে ও সংসারের ছলনায় প্রতারিত হয়ে সমাজ, পরিবার ত্যাগ করে প্রেমিক/স্বামী রূপী পাচারকারী/পাচারের সহযোগীর হাত ধরে অজানার পথে পা বাড়িয়ে অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। তাদের সব স্বপ্ন, আকাংখা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ফলে সেখান থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হলেও তারা বেশীরভাগই লজ্জায়, জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় আর ঘরে ফিরতে চায় না কিংবা পরিবারের সদস্যরা তাকে ফিরিয়ে নিতে চায় না, আবার পরিবার ফিরিয়ে নিলেও সমাজ তাকে মেনে নিতে চায় না।

Dhaka University Institutional Repository

বক্স নং - ৪.৩

কেইস স্টাডি - ৩

মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের ছোট সন্তান বেবী (ছদ্মনাম)। নিজ এলাকা মাদারীপুরের এক গ্রামের স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে পাশের গ্রামের কলেজ পড়ুয়া এক ছেলের সাথে প্রেম হয়। এস.এস.সি পাশ করে কলেজে ভর্তি হওয়ার পর বেবীর ভাইরা তার প্রেমের বিষয়টি জেনে ফেললে অন্যত্র বিয়ে ঠিক করে। তখন ছেলেটির প্ররোচনায় বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করে দু'জনে মিলে ঢাকা চলে আসে। ঢাকার গাবতলীর কাছে এক রুমের একটা বাসা ভাড়া নেয়। বেবীর স্বামীর এক বন্ধুর সহযোগীতায় ৩/৪দিন পরই বেবীর একটা কিন্ডার গার্টেন স্কুলে চাকুরী হয় আর তার স্বামী চাকুরী খুঁজতে থাকে। দুই মাস এভাবে চলে, বেবীর স্বামীর আর চাকুরী হয় না। বেবীর একার আয়ে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল, উপরোন্ত বেবী অনুভব করলো যে সে সন্তান সম্ভবা। সে সময় তার স্বামীর এক কলকাতায় থাকা বন্ধু তার সাথে ওদেরকে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বলল যে, সেখানে ওদেরকে সে ভালো কাজ যোগাড় করে দিতে পারবে। তখন বেবী ও তার স্বামী সেই বন্ধুর সাথে কলকাতায় তার বাড়ীতে গেল। পরেরদিন বেবীর স্বামী কাজের খোঁজে বাইরে বের হয়ে সারাদিনে আর বাসায় ফেরে না। তারপরেরদিন বেবীকে নিয়ে তার স্বামীর বন্ধু বের হয় স্বামীকে খোঁজার উদ্দেশ্যে। বন্ধুটি বেবীকে নিয়ে তখন বৌবাজার পতিতালয়ে এসে এক সর্দারনীর কাছে বেবীকে বিক্রি করে দেয়। বেবী তখন তার বিপদ বুঝতে পেরে সর্দারনীর কাছে কান্নাকাটি করে অনেক অনুরোধ করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু সর্দারনী তাকে মুক্তি দেয় না। তবে সন্তান হওয়া পর্যন্ত সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায়। বেবীর এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়, ছেলেকে সাথে নিয়ে সে এখানে রয়ে যায়। এখন আর বেবীর দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না। দেশে ফিরে কোথায়, কার কাছে যাবে? বাবা-মায়ের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছেড়ে তাকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। সেই ভালোবাসার মানুষটিই এতবড় প্রতারণা করলো, এখন কোন মুখ নিয়ে বাবা-মার কাছে যাবে? এই পাপের পথ থেকে ফিরে গেলে সবাই কি তাকে সহজভাবে মেনে নেবে? তার চাইতে বরং এখানেই থেকে যাবে যতদিন প্রয়োজন। ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার খুব ইচ্ছে। ছেলে মানুষের মতো মানুষ হলে তখন যদি সম্ভব হয় এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য কোথাও বাসা নিয়ে থাকবে।

বক্স নং - ৪.৪

কেইস স্টাডি- ৪

পটুয়াখালীর দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সুমি (ছদ্মনাম)। বাবা অন্যের জমিতে চাষ করে সামান্য যা আয় করেন তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। অভাবের তাড়নায় বড় সন্তান সুমি মাত্র ১৩ বছর বয়সে গার্মেন্টস-এ চাকুরী করতে ঢাকায় আসে। দুই বছর সে গার্মেন্টসে চাকুরী করে। এ সময় প্রতিবেশী (কমিলপুর বাড়ী) রডের দোকানের কর্মচারী এক ছেলের সাথে সুমির প্রেম হয়। এক ঈদের ছুটিতে ছেলেটি সুমিকে কাজী অফিসে নিয়ে যেয়ে বিয়ে করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ঢাকা থেকে লঞ্চে উঠে। লঞ্চ থেকে নেমে বলে যে, সরাসরি বাড়ীতে না যেয়ে ভারতে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে সেখানে বেড়িয়ে বাড়ীতে বিয়ের বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে তার কাছ থেকে একটা পরামর্শ নিয়ে তারপর বাড়ী আসবে। এরপর সুমিকে নিয়ে সীমান্তে এসে এক লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় তার ফুফা শ্বশুর বলে এবং সুমিকে সেই লোকের সাথে কাছেই তাদের বাড়ীতে যেতে বলে। আর সুমির স্বামী একটু কাজ সেরে, কিছু মিষ্টি কিনে একটু পরে আসছে বলে চলে যায়। তখন কথিত সেই ফুফা শ্বশুর সুমিকে নিয়ে বর্ডার পার করে এক বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে এক লোক তাকে রাতের বেলা রেপ করে। এদিকে সুমির স্বামীও আর ফিরে আসে না। পরেরদিন ফুফা শ্বশুর লোকটি সুমিকে এক পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। সেখানে পাঁচ বছর এক বিভীষিকাময় জীবন যাপন করার পর একদিন এক সুযোগে পালিয়ে এলে পুলিশ উদ্ধার করে লিলুয়াহোমে দেয়। দুই বছর ধরে সুমি লিলুয়াহোমে আছে। কোর্টে কেইস চলছে, রায় হলে সে দেশে ফিরতে পারবে। সাত বছর ধরে বিদেশের মাটিতে থেকে সুমির আর ভালো লাগছে না। পতিতালয়ের এক বন্দি জীবন থেকে বেরিয়ে এসে এখন আবার আশ্রয়কেন্দ্রে আরেক বন্দি জীবন কাটাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয় এখান থেকে মেয়েরা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে কি করবে, বাবা-মা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে কি-না? পালিয়ে বিয়ে করেছে, এতদিন দেশের বাইরে এরপর বাড়ীতে ফিরলে সমাজ তাকে খারাপ মেয়ে বলবে, হয়তো মেনে নেবে না। তবুও সে দেশে ফিরতে চায়, বাবা-মায়ের কাছে যেতে চায়, বিদেশের মাটিতে আর ভালো লাগে না।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের পর নিজ দেশে ফিরে আসার পর অভিজ্ঞতা

সংগৃহীত হওয়ার পর থেকে শুরু করে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত, গ্রহণকারী দেশে অবস্থানকালে বিভিন্ন কষ্টকর ও অনৈতিক কাজ করাকালীন সময়ে পাচারকৃতদের অমানুসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। এদের অধিকাংশই হয়তো আর সেই জীবনে থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হয় না। যারা পালিয়ে এসে কিংবা বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংগঠনের মাধ্যমে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে আসে তারাও অধিকাংশ আর পূর্বের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে না। বিদেশে বছরের পর বছর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করা, উদ্ধারের পর প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় কারগারে কিংবা আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পর দেশে ফিরে এসে আবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান, পরিবারে পুনরেকত্রীকরণের পর সামাজিক বঞ্চনা কিংবা পুনরায় পাচার হবার আশকাংয় পুনরায় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া এসব করার ফলে তারা মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণায় তারা অনেক সময় বিধ্বংসী আচরণ করা শুরু করে। আমাদের এই কুসংস্কারচ্ছন্ন এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজ ব্যবস্থায় এসব নারী ও শিশুদের পরিপূর্ণভাবে পুনর্বাসন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুবাই এ উটের জকি হিসেবে যাওয়া এক উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতের পাচারের সহযোগী (পাচারকৃতেকে সন্তান পরিচয় দিয়ে নিয়ে যায়) মহিলা ক্ষোভের সঙ্গে বলেই ফেললেন, ''বিদেশে অনেক ভালো ছিলাম। দামী কাপড়, গহনা, কসমেটিক ব্যবহার করতাম। এখনতো পথের ফকির হলাম। সরকার ফিরিয়ে এনে এখন কি পুনর্বাসন করবে? আমরা যারা বিদেশে কাজ করে খেতাম তাদের নিয়েই সবার যতো চিন্তা। কিন্তু দেশে ফিরেই বিমান বন্দর থেকে এখানে আসার পথে দেখলাম এদের মতো এক ছোট ছেলে ডাস্টবিনের মধ্যে ময়লা কুড়াচ্ছে, খাবার খুঁজছে। এদের জন্য সরকার কিছু করতে পারে না? এই ছেলেটি দেশে বসে ভাই-বোন নিয়ে না খেয়ে মরছিল, বড় হলে হয়তো এদের মতো ডাস্টবিনে খাবার খুঁজতো, সেই ছেলেকে আমি বিদেশে নিয়ে গেছি। এদেরকে সারা বছর আদর যত্নে রেখে বছরে ২/৩ মাস কাজ করায়। একটু কষ্ট হলেও খেতে পরতে পারতো, বাড়ীতে টাকা পাঠাতো যা দিয়ে মা ও অন্যান্য ভাই-বোনরা খেয়ে পরে বাঁচতো। এখন দেশে ফিরিয়ে এনে এর জন্য সরকার বা আপনারা কি করতে পারবেন? লেখাপড়া শিখিয়ে চাকুরী দিতে পারবেন? তাহলে ওর মতো যারা দেশে রয়েছে তাদের জন্য কেন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না?'' এভাবে বুঝিয়ে বলতে না পারলেও এধরণের জিজ্ঞাসা প্রত্যাবাসিত পাচারকৃত শিশুদেরও চোখে-মুখে। সব সময় তাদের মধ্যে এক আতকং তারা এখন কি করবে, কি খাবে, কিভাবে বাঁচবে? এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ পাচারকৃতই উদ্ধারের পর কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণের পর পাচার শব্দটার সাথে পরিচিত হয় এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে পেরে নতুন করে মানসিকভাবে কষ্ট পায়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪ জন (২৯.১৬%) একেবারেই বোঝে না পাচার কি, তারা অল্পদিন পূর্বে উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত হয়েছে। ৯ জন (১৯.৭৫%) স্বীকারই করে না যে তারা পাচার হয়েছে কিংবা পাচার হতে যাচ্ছিল। পথে নির্যাতনের শিকার ও গন্তব্যে পৌঁছে জোরপূর্বক অনৈতিক ও কষ্টকর কাজে লাগানোর পর বুঝতে পেরেছে যে তারা প্রতারিত হয়েছে কিন্তু পাচার বোঝেনি এমন

Dhaka University Institutional Repository

আছে ১৫ জন (৩১.২৫%)। পুলিশ উদ্ধার করার পর ও পাচারকারীকে জেলে দেয়ার পর ৭ জন (১৪.৫৮%) বুঝেছে যে তারা পাচার হয়েছে। এবং বাকী ৩ জন উদ্ধারের পর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় পাবার পর ধীরে ধীরে বুঝেছে যে তারা পাচার হয়েছিল।

বক্স নং - ৪.৫

কেইস স্ট্যাডি - ৫

বেনাপোল (যশোর) এর মেয়ে পলি (ছদ্মনাম)। ১ভাই, ১বোনের মধ্যে বড় পলির বাবা মারা গেছে খুব ছোট বেলায়। মা তাঁতীর শাড়ী, থ্রি-পিছ এসব বিক্রি করে সংসার চালায়। মাত্র ১৫বছর বয়সে স্থানীয় এক ঘটকের মাধ্যমে পলির বিয়ে ঠিক করে তার মা। নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয় কিন্তু বিয়ের পর পরই পলির মা দেখলো যে, যে ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করেছিল সেই ছেলে নয় অন্য ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছে ঘটক যার আর একজন স্ত্রী আছে। সাথে সাথেই পলির মা বিয়ের দিনই আবার মেয়েকে দিয়ে ডিভোর্স করিয়ে নেয়। তখন গ্রামের লোকের বিভিন্ন কথা শুনে পলির মা আবার পলির বিয়ে ঠিক করে এক বয়স্ক বিবাহিত লোকের সাথে। কিন্তু পলির সে বিয়েতে মত ছিল না। সে সময় ভারতের বোম্বে থেকে পলির এক মামাতো বোন দেশে বেড়াতে আসে, তার স্বামী বোম্বেতে হোটেলের ব্যবসা করে। তখন পলি বিয়ের ভয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে সেই মামাতো বোনের সাথে বোম্বে চলে যায়। বোন বলেছিল যে, কয়েকদিন তার কাছে বেড়াবে তারপর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে সে আবার পলিকে দেশে ফিরিয়ে আনবে। বোম্বে আসার পর পলির বোন বলল যে, সেখানে তার কিছু শত্রু আছে যারা বলে দিতে পারে যে পলি এ বাসায় আছে, কিন্তু পাসপোর্টে এসেছে। তাহলে পলিকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে, তাই পলির কয়েক দিনের জন্য এক প্রতিবেশীর কাছে থাকা নিরাপদ হবে। পলিও ভাবলো আসার পথে বনগাঁতে একদল যুবক পুজার চাঁদা তোলার সময় পলিকে ধরে জেরা করছিল যে তার বোন তাকে বিক্রি করে দিচ্ছে কি-না। এসব কথা মনে করে পলি বোনের কথায় সম্মত হলে পলিকে তার বোন এক প্রতিবেশীর ঘরে রেখে আসে। পরের দিন প্রতিবেশী লোকটি পলিকে এক লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়। যার কাছে বিক্রি করে দেয় সে পলিকে নিয়ে একটা রেল স্টেশনে এলে পুলিশ উদ্ধার করে বোম্বের একটা আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে ২বছর থাকার পর ওরা কলকাতার একটি এনজিও সংলাপ এর আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। সংলাপেও ২বছর থাকার পর বাংলাদেশের এনজিও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহায়তায় দেশে ফিরে এসে মিশনের আশ্রয়কেন্দ্রে আছে ১মাস ধরে। এত কিছুর পরও পলি তার বোনকে দোষ দেয় না। পলি মনে করে বেড়াতে যেয়ে সে একটা বিপদে পড়ে গেছে, সে পাচার হয়নি। তার বোনের কোন দোষ নেই। পলির বোন বুঝতে পারেনি যে প্রতিবেশী লোকটা এরকম একটা কাজ করবে তাহলে সে তার কাছে পলিকে রাখতো না। বর্তমানে পলি মিশনে দর্জির কাজ শিখছে। ইচ্ছে আছে এক বছর এখানে থেকে কাজ শিখে তারপর বাড়ীতে ফিরে যাবে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তবে পলির দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে বাড়ী থেকে না বলে মামাতো বোনের সাথে বেরিয়েছিল। এখন ৪/৫ বছর পর গ্রামে ফিরে গেলে গ্রামের লোকেরা তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে? তারা তো বুঝবে না যে পলি ভালো জায়গায়, ভালোভাবে ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বক্স নং - ৪.৬

কেইস স্ট্যাডি - ৬

ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার এক গ্রামের মেয়ে চম্পা (ছদ্মনাম)। ৬ বোন, বাবা-মাসহ বড় সংসারের বোঝা বহন করতে কৃষক (অন্যের জমিতে চাষাবাদ করা) বাবা হিমশিম খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় চম্পার যখন মাত্র ৯ বছর বয়স তখন প্রতিবেশী এক চাচা এসে চম্পার বাবাকে বলল , "তোমার ছেলে নেই, মেয়েটাতো অনেক চটপটে, ওকে আমার সাথে ভারতে পাঠাও ভালো কাজ যোগার করে দেব।" প্রথমে চম্পার বাবা রাজি হয় না কারণ এর আগে একবার বড় মেয়েটাকেও একজন এই কথা বলে নিয়ে গেছে, তার আর কোন খোঁজ নেই। পরে সেই লোক বাবাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে বলল যে কাজ করতে পাঠালে এরকম মাসে মাসে তোমার মেয়ে টাকা পাঠাবে। তখন চম্পার বাবা চম্পাকে কাজ করার জন্য সেই লোকের সাথে পাঠায়। লোকটি চম্পাকে নিয়ে খুব ভোরে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ট্যাম্পুতে করে ভারতের এক গ্রামে নিয়ে এসে এক বাড়ীতে উঠায়। সেখানে তার মতো আরো অনেক ছেলে-মেয়েকে দেখতে পায় রাতের বেলা। সবাইকে একটা ঘরে গাদাগাদি করে মেঝেতে ঘুমাতে দিয়েছে। পরেরদিন ভোর ৫টার সময় বিড়ির ফ্যাক্টরীতে কাজ করাতে নিয়ে গেছে। রাত ১২টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করেছে। দুই বেলা খেতে দেয়, তাও আবার এক হাজারটা বিড়ি না বানানো পর্যন্ত ভাত দেয় না। এভাবে দিন-রাত পরিশ্রম করে কিন্তু কোন বেতন দেয় না। ৩/৪ মাস সেখানে থাকার পর একদিন খুব ভোরে টয়লেটে যাওয়ার নাম করে ৫জন ছেলে-মেয়ে একত্রে বুদ্ধি করে পালিয়ে আসে। আখ ক্ষেত, পাট ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে অনেক কষ্টে সীমান্তে এসে পাতা কুড়ানোর অভিনয় করে সীমান্ত পার হয়ে দেশে চলে আসে। বাড়ীতে আসার পর পুনরায় পাচার হবার আশংকায় এবং সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য এসিডি (এনজিও) এর এক কর্মকর্তার সহায়তায় রাজশাহীতে অবস্থিত এসিডির আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়। গত চার বছর ধরে চম্পা এখানে আছে, আলোই কাটছে তার দিন। এখানে সে লেখাপড়া শিখছে (চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে), ব্লক, বাটিক, টাই-ডাই শিখছে যাতে এখান থেকে চলে যাওয়ার পর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। মানসিক বিকাশের জন্য নাচ, গান, নাটক এসবও শেখানো হচ্ছে এখানে। এসিডি চম্পার মতো আরো অনেক পাচারকৃত এবং সুবিধা বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছে যারা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে থাকতে পারবে।

দুবাই ফেরত পাচার সহযোগী নারী-পুরুষের স্বীকারোক্তি

আলোচ্য গবেষণায় পাচারকৃত নারী ও শিশু ছাড়াও উটের জকি হিসেবে দুবাই যাওয়া শিশুদের পাচার হতে সহযোগীতা করেছে এমন ৫ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এরা সবাই পাচারকৃত শিশুদের পিতা-মাতার পরিচয়ে শিশুদের সাথে বিদেশে গিয়েছিল। আবার শিশুদের সাথেই এদেরকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে দুই জন মহিলা ও দুই জন পুরুষ সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী, অন্যরা অন্যকারো স্বামী/স্ত্রী পরিচয়ে গিয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই ২/৩ জন করে শিশু (দরিদ্র প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয়ের শিশু সন্তান) কে নিজের সন্তান পরিচয়ে বিদেশে নিয়ে যেয়ে পাচারকার্যে সহযোগীতা করেছে। এদের ভাষ্য অনুযায়ী এরা কেউই জানতো না যে বিদেশে নিয়ে এসব শিশুদেরকে দিয়ে কি কাজ করানো হবে। পাচারকারীরা তাদের বলেছে যে যদি ২/১ জন বাচ্চা ছেলে নিয়ে আসতে পারে তাহলে বাচ্চাসহ তাদেরকে বিদেশে কাজ করতে পাঠাতে পারবে। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে কোন ধনীলোকের বাড়ীতে ঘরের কাজ করবে মহিলারা এবং বাইরের কাজ করবে পুরুষরা আর বাচ্চারা মালিকের ছেলে-মেয়ের সাথে খেলা করবে, লেখাপড়া করবে। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার পর দেখলো যে বাচ্চাদের দিয়ে উটের জকির কাজ করানো হচ্ছে আর মহিলাদের উটের মালিকের বাড়ীতে কাজ দেয়া হচ্ছে ও পুরুষদেরকে উটের যত্ন নেওয়ার কাজ দেয়া হচ্ছে। উটের জকি হিসেবে বাচ্চাদেরকে মাসে এক হাজার দিরহাম এবং পুরুষ ও মহিলাদেরকে পাঁচশত দিরহাম করে দেয়া হতো। বাচ্চাদের

Dhaka University Institutional Repository

এক হাজার দিরহামের মধ্যে পাঁচশত দিরহাম বাচ্চাদের খরচ বাবদ তাদের সাথে যাওয়া অভিভাবকরা রেখে দিয়ে বাকী পাঁচশত দিরহাম দেশে বাচ্চাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতো। তাদের মতে, যদিও তারা কোন কিছু না বুঝেই বাচ্চাদের নিয়ে বিদেশে গিয়েছে তবুও যাওয়ার পর সেখানে ভালোই ছিল। উটের জকির কাজ একটু কষ্ট হলেও বাচ্চাদের সারা বছর আদর যত্নে রেখে বছরে ২/৩ মাস কাজ করাতো। এতে ওরাও ভালো থাকতে পারতো আবার বাবা-মায়ের জন্যও দেশে টাকা পাঠাতে পারতো। তবে পাচারকৃত শিশুরা বলেছে যে, ২/৩ মাস করে বছরে ২/৩ বার তাদেরকে জকির কাজ করতে হতো। পাচার সহযোগী এক দম্পতি ৪ জন ছেলে শিশু নিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে ২ জন নিজের সন্তান এবং ২ জন প্রতিবেশীর ছেলে ছিল। নিজের ছেলেদের দিয়ে তারা উটের জকির কাজ না করিয়ে লেখাপড়া করিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা বলেছে যে তাদের ছেলেরা একটু দূর্বল, অসুস্থ এই কাজ ওরা করতে পারবে না বলে ওদেরকে দেয়নি। সর্বোপরি পাচার সহযোগীদের কেউই এসব শিশুদের বিদেশে নিয়ে যাওয়াটাকে পাচার বলে স্বীকার করে না। তাছাড়া উটের জকির কাজ কিছুটা কষ্টকর এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে পূর্বে কিছু অবহিত করা না হলেও দেশে খেয়ে-না খেয়ে কোনরকম বেঁচে থাকার তুলনায় বিদেশে জকির কাজ করাকে খুব বেশী অমানবিক ও অনৈতিক বলে তারা মনে করে না।

উপসংহার

পাচারকৃত নারী ও শিশুদের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাচারের পূর্বে পাচারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হওয়ার আগে ও পরে, পাচারের পর গন্তব্য দেশে পৌঁছানোর পর, উদ্ধার ও প্রত্যাবাসিত হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসার পর প্রতিটি স্তরে তারা এক অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়। অধিকাংশ পাচারকৃতই সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশু। পাচারের পূর্বে নিজ পরিবারেও অনেকক্ষেত্রে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করেছে। তাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগই নেয় পাচারকারীরা। এ কারণেই হয়তো উটের জকি শিশু পাচারের সহযোগীরা এসব শিশুদের দেশে না খেয়ে থাকার চাইতে বিদেশে জকির কাজ করে নিজে ভালো খেয়ে পরে, বাড়ীতে টাকা পাঠানোটাকে অনৈতিক বা অমানবিক বলে স্বীকার করতে চায় না। তবে উটের জকি এসব শিশুরা তাদের ভালো-মন্দ বুঝে প্রকাশ করতে না পারলেও যারা কিছুটা বড়, কিশোর-কিশোরী কিংবা নারী তারা বুঝতে পারে যে, তারা প্রতারিত হয়েছে এবং বিদেশে অনৈতিক ও বাধ্যতামূলক শ্রমদানের চাইতে নিজ গৃহে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকা অনেক ভালো।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়াঃ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়াঃ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ

পাচার বিষয়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দু'টি ইস্যুতে কাজ করে থাকে। যেমন-

১. পাচার প্রতিরোধ

২. পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন

পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে সরকারী ও বেসরকারী ভূমিকা আলোচনার পূর্বে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সাথে উদ্ধারের বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। প্রত্যাসন ও পুনর্বাসন-এর পূর্বে পাচারকৃতদের উদ্ধার করা জরুরী। পাচারকৃত নারী ও শিশু উদ্ধার দু'ভাবে হতে পারে। যেমন-

১. উৎস দেশে উদ্ধার

অনেক সময় সীমান্ত পার হওয়ার পূর্বেই সীমান্ত এলাকায় অথবা অভ্যন্তরীণ পাচারের ক্ষেত্রে নিজ দেশেই পাচারকৃত নারী ও শিশুকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (২৯.১৬%) উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত পাড়ি দেয়ার পূর্বেই। এই উদ্ধারকার্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ), সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, সচেতন জনগণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান গবেষণায় উৎস দেশে ১৪ জন উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদের মধ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) কর্তৃক ৩ জন, স্থানীয় মেম্বার কর্তৃক ৫ জন, এক কলেজ ছাত্রী কর্তৃক ৩ জন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ) কর্তৃক ৩ জন (অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার) উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎস দেশে পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সন্দেহ হলে তারা নারী ও শিশুদেরকে আটক করে। আবার কখনও লোক মারফত খবর পেয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান বা মেম্বার নির্দিষ্ট স্থানে এসে পাচারকারীসহ নারী ও শিশু উদ্ধার করে। এভাবে সচেতন জনগণ কিংবা সামাজিক সংগঠন নারী ও শিশু উদ্ধার করে। এরপর তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ)-এর সাথে যোগাযোগ করে। পুলিশ আটককৃতদের জবানবন্দীসহ এজাহার ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে পাঠান। পাচারকারীদের দোষ প্রমাণিত হলে এবং পাচারকৃতের অভিভাবক উপস্থিত থাকলে নারী ও শিশুকে অভিভাবকের হাতে তুলে দেয়া হয়। অন্যথায় তাদের সবাইকে জেল হাজতে রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পাচারকারীরা জামিনে বের হয়ে আসে কিন্তু পাচারের শিকার নারী ও শিশু উদ্ধার হয়েও জেল হাজতে বন্দি হয়ে থাকে।

পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের উপর কাজ করে এমন বেসরকারী সাহায্য সংস্থা (এনজিও) অনেকক্ষেত্রে জেল হাজতে বন্দি এসব নিরাপরাধ নারী ও শিশুর সংবাদ পেয়ে তাদের উদ্ধার করে। এসব সংস্থা স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করে আইন অনুযায়ী তাদেরকে জেল হাজত থেকে মুক্ত করে পুনর্বাসন-এর জন্য তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এরপর ঠিকানা নিশ্চিত হয়ে আগ্রহী অভিভাবকদের কাছে তাদের ফিরিয়ে দেয় এবং যাদের অভিভাবক ফিরিয়ে নিতে চায় না কিংবা যাদের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে দেয়া হয়।

অভ্যন্তরীণ পাচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় পতিতালয় থেকে নারী ও মেয়ে শিশুদের উদ্ধার করে পুনর্বাসনের জন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়।

২. গ্রহণকারী দেশে উদ্ধার

গ্রহণকারী দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার করা হয়। কখনও কখনও ভারত ও পাকিস্তানে সরকারীভাবে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে পতিতালয়গুলো থেকে পাচারকৃত নারী ও মেয়ে শিশুদেরকে উদ্ধার করা হয়। তবে এ প্রক্রিয়ায় উদ্ধারের পর তারা অধিকাংশই জেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, কড়া পাহাড়ায় মূলত বন্দিদশায় দিনাতিপাত করে। অনেক সময় এই সুযোগ নেয় সক্রিয় পাচারকারীদল এবং তারা পুনরায় পাচারের শিকার হয়।

অনেক সময় গ্রহণকারী দেশের সমাজকর্মী ও এনজিও কাজ করতে গিয়ে পাচারকৃতের খোঁজ পায় এবং পুলিশকে অবহিত করে। পুলিশ তখন উদ্ধার করে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয় সমাজকর্মী বা এনজিও-এর মাধ্যমে কিংবা সরাসরি কোন সরকারী হোমে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় পাচারকৃত নারী বা শিশু কোন সুযোগ বুঝে কর্মস্থল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তখন পথে কোন পুলিশ বা সমাজকর্মী বা সচেতন নাগরিক কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই পায় প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে।

বর্তমান গবেষণায় ১৪ জন উটের জকি শিশু উৎস দেশ (বাংলাদেশ) ও গ্রহণকারী দেশের সরকারের সহযোগীতায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবাসিত হয়েছে। ৭ জন নারী ও শিশুকে গ্রহণকারী দেশের পুলিশ রেল স্টেশন, পতিতালয় ইত্যাদি স্থান থেকে উদ্ধার করেছে। ৪ জন কর্মস্থল থেকে

Dhaka University Institutional Repository

পালিয়ে এলে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। ৩ জনকে এনজিও এবং সমাজকর্মী উদ্ধার করে। ৩ জন কর্মস্থল থেকে পালিয়ে সীমান্তে এসে পাতা কুড়ানোর অভিনয় করে পালিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। পাচারকৃতের পরিবারের চাপে ১ জনকে পাচারকারী নিজেই ফিরিয়ে এনেছে এবং ২ জন ভারতের পতিতালয়ে এখনও আছে যারা আর ফিরতে চায় না।

প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া

প্রত্যাবাসন শব্দের শাব্দিক অর্থ ব্যক্তির নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন। আন্তর্জাতিক পাচারের ক্ষেত্রে সীমান্ত অতিক্রমকারী পাচারকৃতের নিজ দেশে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বলা হয়। গ্রহণকারী দেশে পাচারকৃত নারী ও শিশু উদ্ধারপ্রাপ্তের পর তাদেরকে কোন আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে নাগরিকত্ব নিশ্চিত হয়ে প্রত্যাবাসনের কাজ শুরু হয়।

সাধারণতঃ গ্রহণকারী দেশে উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশু কোন এনজিও-এর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত হলে তারা উৎস দেশের এনজিও-এর সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যাবসনের ব্যবস্থা করার জন্য। ইতোমধ্যে গ্রহণকারী দেশে কোর্টে মামলার কাজ চলে। এরপর উৎস দেশের এনজিও নিজ দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ যোগাযোগ করলে তারা দূতাবাসের সহযোগিতায় পাচারকৃতকে প্রত্যাবাসিত করে এনজিও-এর কাছে দিয়ে দেয় পুনর্বাসনের জন্য। এছাড়া গ্রহণকারী দেশে সরকারী কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত হলে সরাসরি তারা উৎস দেশের দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে এবং কোর্টের মামলা নিস্পত্তি হওয়ার পর দূতাবাস উৎস দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পাচারকৃতকে প্রত্যাবাসিত করে। দূতাবাস আগে থেকে বাংলাদেশের (উৎস দেশের) কোন এনজিওকে সংবাদ দিয়ে রাখে তারা সীমান্ত এলাকা থেকেই পাচারকৃতকে নিয়ে যায় তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসনের জন্য।

প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের উর্ধ্বে পাচারকৃত নারীদের সবচেয়ে বেশী সমস্যা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রের নিয়মানুযায়ী ১৮ বছরের বেশী বয়সের কাউকে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয় না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৮ বছরের উর্ধ্বে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীদেরকে জেল হাজতে রাখা হয়। অনেকদিন পর্যন্ত কোর্টে মামলা চলাকালীন সময়ে তারা জেল হাজতে বন্দি থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন এনজিও কিংবা সরকারী পর্যায়ে কেউ তার খোঁজ রাখে না। এরপর কোর্ট থেকে ছাড়া পাবার পর সক্রিয় পাচারকারী তার অভিভাবক সেজে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং পুনরায় সে পাচারের শিকার হয় নতুবা নিরাপত্তা হেফাজতের নামে বছরের পর বছর জেল হাজতে অসহনীয় অবস্থায় বন্দি থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় ১৪ জন উটের জকি শিশুকে বাংলাদেশ সরকার দুবাই সরকারের সহযোগিতায় প্রত্যাবাসিত করেছে। ১০ জন নারী ও শিশুকে এনজিও (ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশণ, বিএনডাব্লিউএলএ ও এসিডি) সরকারের সহযোগিতায় প্রত্যাবাসিত করেছে। ৩ জন ভারত থেকে পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে এসেছে। ৫ জন ভারতের সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় রয়েছে। ২ জন ভারতের (কলকাতা) এক পতিতালয়ে কর্মরত আছে, তারা আর দেশে ফিরতে চায় না। ১১ জন পাচারের পূর্বেই সীমান্ত এলাকায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ৩ জন অভ্যন্তরীণ পাচারের শিকার, উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা নিজ বাসভূমি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বা উৎখাত কোন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে পুনর্বাসন। পাচারকৃত নারী ও শিশুর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পাচারের বিভিন্ন স্তরে তারা এক দুর্বিষহ ও অবর্ণনীয় কষ্টকর জীবন-যাপন করেছে। এমতাবস্থায় উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী শিশুর জন্য গ্রহণকারী দেশে কিংবা প্রত্যাবাসনের পর নিজ দেশে পুনর্বাসনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে দু'টি প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া

২. পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া

এই দু'ধরণের পুনর্বাসন আবার কয়েকটি ধাপে হয়ে থাকে। যেমন- শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বাসন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের কিছু সংস্থা এবং কয়েকটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থা (এনজিও) কাজ করে যাচ্ছে এবং উদ্ধারকৃতদের জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্র।

পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া:

পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হতে পারে। যেমন- পাচারকৃত ব্যক্তির নিজ উদ্যোগে পুনরুদ্ধার যেখানে সে অন্য কোথাও থেকে কোন প্রকার সহযোগিতা পায় না। পক্ষান্তরে, অন্য প্রকার পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় পাচারকৃত ব্যক্তি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

নিজ উদ্যোগে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সহযোগিতা ছাড়াই একজন পাচারকৃত ব্যক্তি কখনও কখনও ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আবার কখনও কখনও ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিকর পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না কিন্তু কালক্রমে সে সেই অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত হয় এবং সেই পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের সুবিধা ভোগ করে থাকে।

স্ব-উদ্যোগে কিংবা কোন প্রকার সহযোগিতার মাধ্যমে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের উদ্ধারের পর যাদের অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া যায় না কিংবা পেলেও সামাজিক চাপের ভয়ে যাদের অভিভাবকরা ফিরিয়ে নিতে চায় না তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়। সরকারের সহায়তায় কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা দাতা সংস্থার অর্থায়নে এসকল আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পাচারের বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, পাচারকৃতরা প্রতিটি স্তরেই প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে। ফলে উদ্ধারের পর দেখা যায় তারা অধিকাংশই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের আশ্রয়কেন্দ্রে এধরণের মানসিক ভারসাম্যহীন একজন মেয়ে ও একজন ছেলে উত্তরদাতা পাওয়া গেছে যাদের প্রশ্নত্তোরে আশ্রয়কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সহযোগীতা প্রয়োজন হয়েছে। এছাড়া কলকাতার লিলুয়াহোমে কয়েকজন মেয়েকে দেখা গেছে যারা বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় স্বতন্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বন্দি হয়ে আছে। এ কারণে উদ্ধারের পর প্রথমেই প্রয়োজন পাচারকৃতের মানসিক পুনর্বাসন। এ লক্ষ্যে নারী ও শিশুদেরকে বিভিন্নভাবে কাউন্সিলিং, অভয়দান, স্বাভাবিক আচরণ ও বিনোদনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা হয়।

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হওয়ার পর থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়া ও ক্ষেত্র বিশেষে পথিমধ্যে লাঞ্ছিত হওয়া, গ্রহণকারী দেশে বাধ্যতামূলক ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত হওয়া এসবের ফলে পাচারকৃত নারী ও শিশুরা শারীরিকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে এমনকি মারাত্মক রোগের জীবানু বহন করে আনে। শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এসব দিক বিবেচনায় রেখে মানসিক চিকিৎসার পাশাপাশি শারীরিক চিকিৎসাও প্রদান করা হয়ে থাকে।

পুনর্বাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। এ লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি শিক্ষা যেমন- সেলাই, কুটিরশিল্প, ব্লক, বাটিক ইত্যাদি শেখানো হয় যাতে পরবর্তীতে তারা আয়মূলক কিছু করতে পারে। সাহায্য সংস্থাগুলো অনেক সময় এসকল নারী ও শিশুদেরকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে চাকুরীর ব্যবস্থা কিংবা আয়মূলক কাজ করার জন্য আর্থিক সহায়তা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। নিয়মিত লেখাপড়া করা, টিভি দেখা, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারী ও শিশুরা সমাজে মিশতে শেখে এবং সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে।

অন্যদিকে অপর এক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় পাচারকৃত ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পেলেও সে পাচারের মতো ক্ষতিকর বা কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যেমন বিভিন্ন জেলখানার নিরাপদ হেফাজত কিংবা ভবঘুরে কেন্দ্র এবং কোন কোন বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র সমূহে পাচারকৃতদের বছরের পর বছর এমন বন্দি অবস্থায় রাখা হয় যা তাদের কাছে পাচারের মতোই কষ্টকর।

নিম্নে রেখাচিত্র ৫.১ এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া দেখানো হলো।

রেখাচিত্র - ৫.১

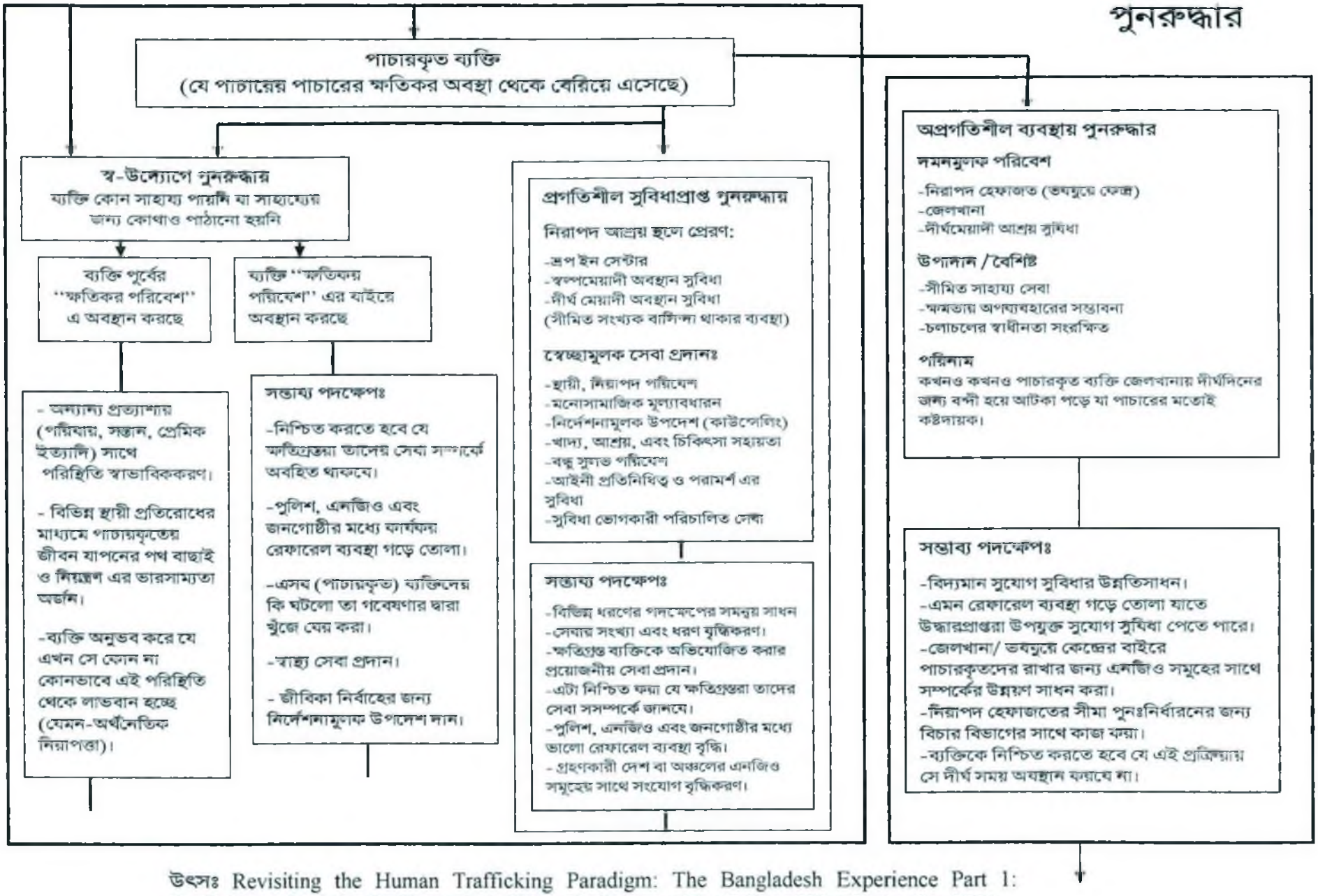

উৎসঃ Revisiting the Human Trafficking Paradigm: The Bangladesh Experience Part 1: Trafficking of Adults- By Bangladesh Thematic Group on Trafficking, IOM, September 2004.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া

উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের সফল পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন ধরণের পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। যেমন- পারিবারিক পুনঃএকত্রীকরণ, সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ, অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণ ইত্যাদি।

পাচারকৃতের জন্য নিজ পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত উদ্ধারপ্রাপ্তদের সাময়িকভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের সাথে সাথে একজন পাচারকৃতের প্রকৃত পুনর্বাসন তখনই ঘটবে যখন সে পূর্বের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় নিজ পরিবারে পুনঃএকত্রীত হতে পারবে। কিন্তু পুনর্বাসনের এই ধাপটির বাস্তবায়ন বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা দেয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকলজ্জার ভয়ে কিংবা সমাজে নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও মেয়ে শিশুদেরকে বাবা-মা, ভাই-বোন বা পরিবারের সদস্যরা গ্রহণ করতে চায় না বা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন মেয়ে অপহৃত হয়ে বা স্বেচ্ছায় বাড়ী থেকে পালিয়ে বা হারিয়ে যাওয়ার পর যদি সে কোনদিন ফিরে আসে তখন তার 'সতীত্ব' নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে সমাজ তাকে 'নষ্টা' মেয়ে নামে আখ্যায়িত করে। এমতাবস্থায় তার পরিবার তাকে মেনে নিলে অনেক সময় পুরো পরিবারকেই একঘরে করে দেয় সমাজ। এভাবে মেয়েটি পুনরায় পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

অর্থনৈতিকভাবেও পরিবার এবং সমাজে নারীর পুনঃএকত্রীকরণ কঠিন হয়ে পড়ে। পাচার হয়ে গ্রহণকারী দেশে নারীরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। কিন্তু ফিরে আসার পর পাচারকৃত নারী সম্পর্কে সমাজের লোক ঢালাওভাবে 'অসামাজিক' কাজে লিপ্ত থাকার বদনাম দেয়। ফলে যেখানেই সে কাজ করতে যায় সেখানেই তাকে মানসিক ও শারীরিক বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। পাচারকৃত একজন ছেলে শিশু যে ধরণের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা পায় সমাজ ও পরিবার থেকে তাতো নারী বা মেয়ে শিশুরা পায়ই না বরং নিজ পরিবারও তার উপর দোষারোপ করে। এই পরিস্থিতিতে কখনও কখনও সেই নারী বা তার পুরো পরিবারকেই স্থানান্তরিত হতে হয়। এক সময় পাচারকৃত নিজেও নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করে এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি আত্মহত্যার পথও বেছে নেয় অনেক সময়।

উক্ত পরিস্থিতিতে অনেকক্ষেত্রে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে হয়। পাচারের পর দীর্ঘ সময় কষ্টকর বন্দি জীবন কাটিয়ে, অনেক সময় প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় বিদেশে আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা জেলে বেশ কয়েক বছর থাকার পর দেশে ফিরে আর আশ্রয়কেন্দ্রের বন্দি জীবন তাদের ভালো লাগে না। দেশে ফিরে আর একটা দিনও বাড়ীর বাইরে থাকতে ইচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

করে না। তখন তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য কোন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়াও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বর্তমান গবেষণায় এমন ৩ জন প্রত্যাবাসিত নারী রয়েছে যারা উদ্ধারপ্রাপ্তের পর ভারতের আশ্রয়কেন্দ্রে ছিল যথাক্রমে ২ বছর, ৩ বছর ও ৪বছর এবং প্রত্যাবাসনের পর বাংলাদেশে একটি এনজিও-এর আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছে ১ মাস পূর্বে। দীর্ঘদিন বিদেশের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পর বাংলাদেশে এসে এই একমাসেই তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে, তাদের আর একদিনও আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে ইচ্ছে করে না। বৈধ অভিভাবক সনাক্তকরণ, পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ এসব করতে যতটা সময়ের প্রয়োজন ততটা সময়ও তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে ভালো লাগছে না। এরা কোন প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করছে না এবং এদের মধ্যে একজন দিনরাত কান্নাকাটি করতে করতে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

নিম্নে পাচারকৃত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক একত্রীকরণ প্রক্রিয়া এবং সফল ও অসফল সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া রেখাচিত্র ৫.২, ৫.৩ এবং ৫.৪ এর সাহায্যে দেখানো হলো।

রেখাচিত্র- ৫.২

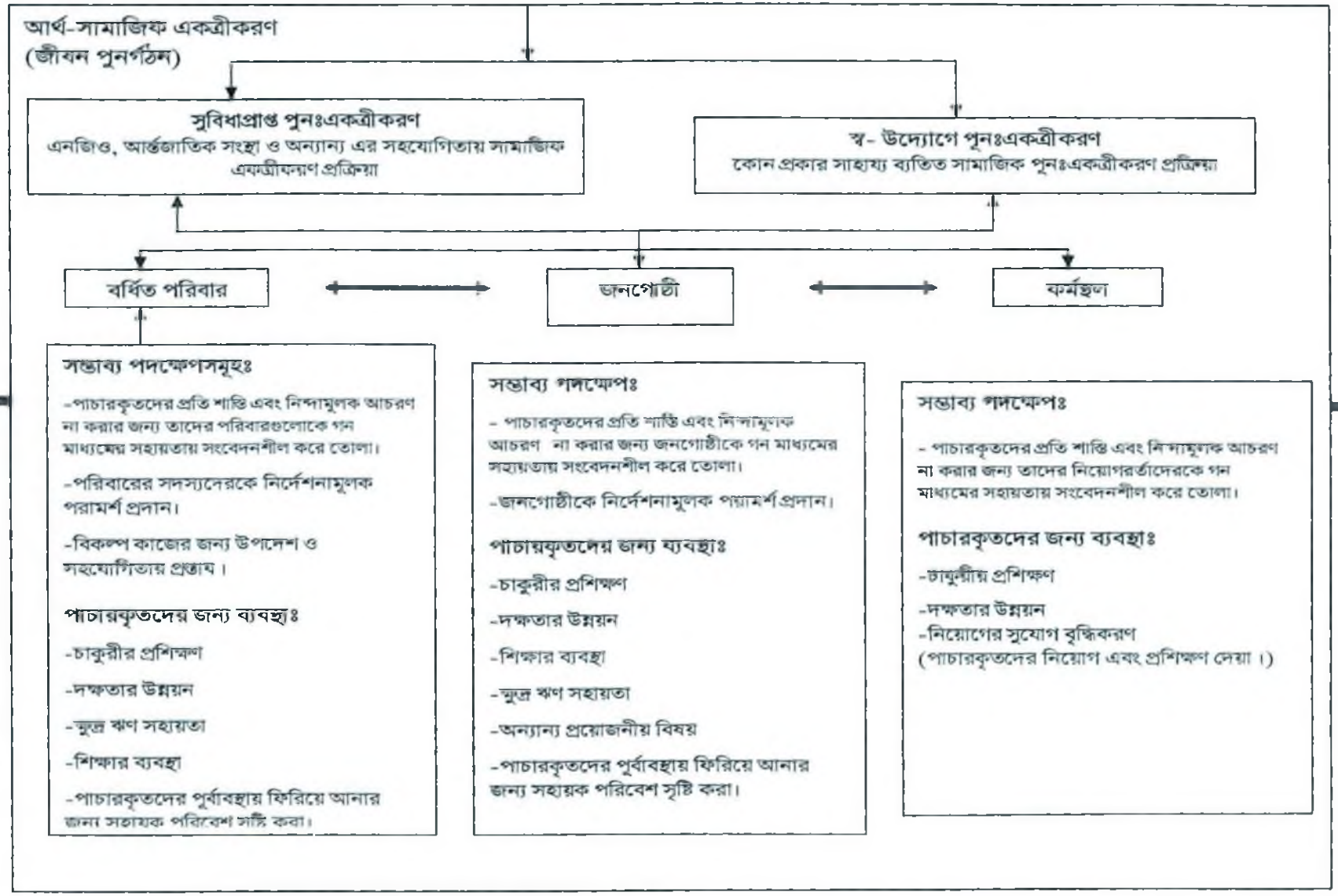

উৎসঃ Revisiting the Human Trafficking Paradigm: The Bangladesh Experience Part 1: Trafficking of Adults- By Bangladesh Thematic Group on Trafficking, IOM, September 2004.

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র- ৫.৩

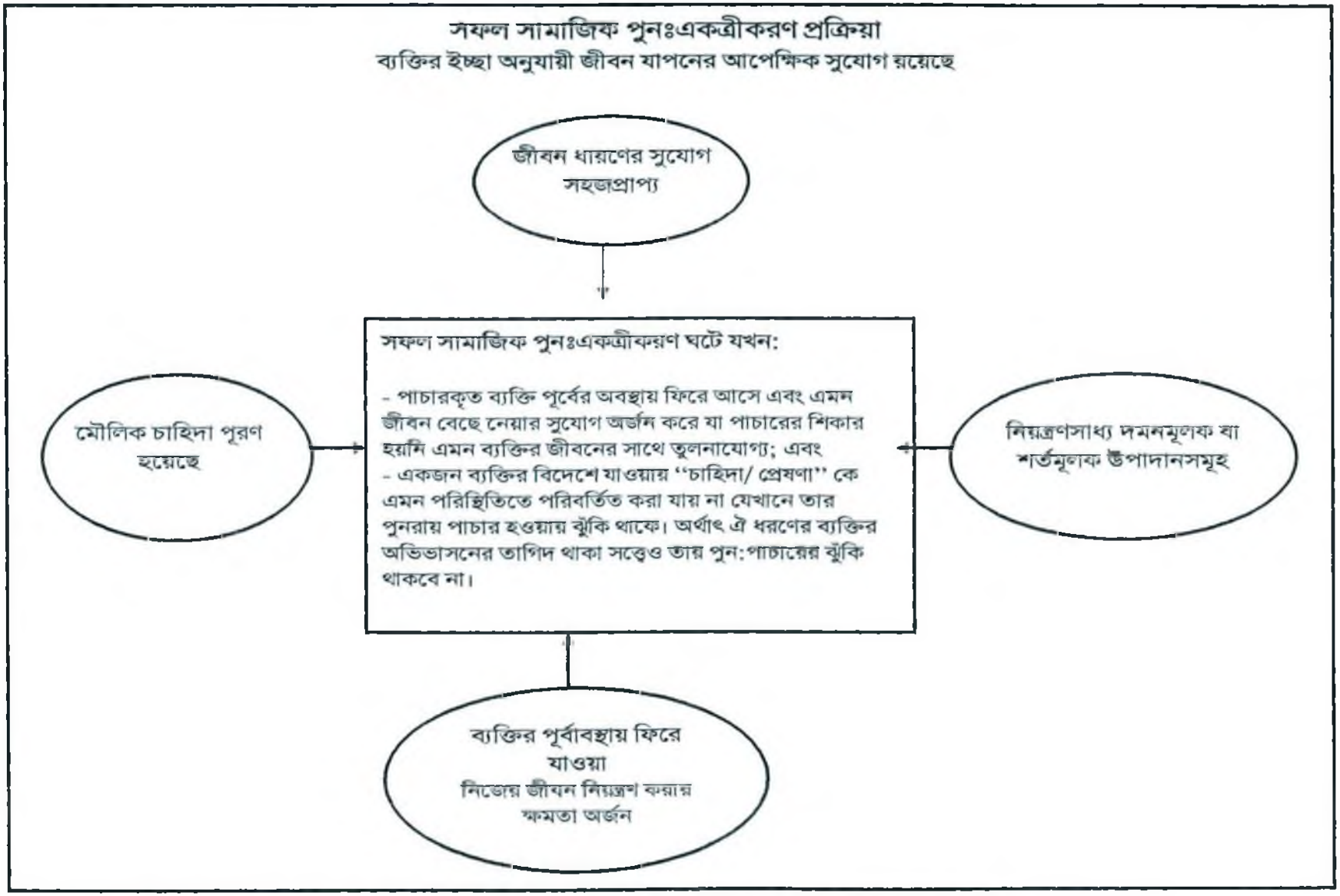

উৎসঃ Revisiting the Human Trafficking Paradigm: The Bangladesh Experience Part 1: Trafficking of Adults- By Bangladesh Thematic Group on Trafficking, IOM, September 2004.

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র- ৫.৪

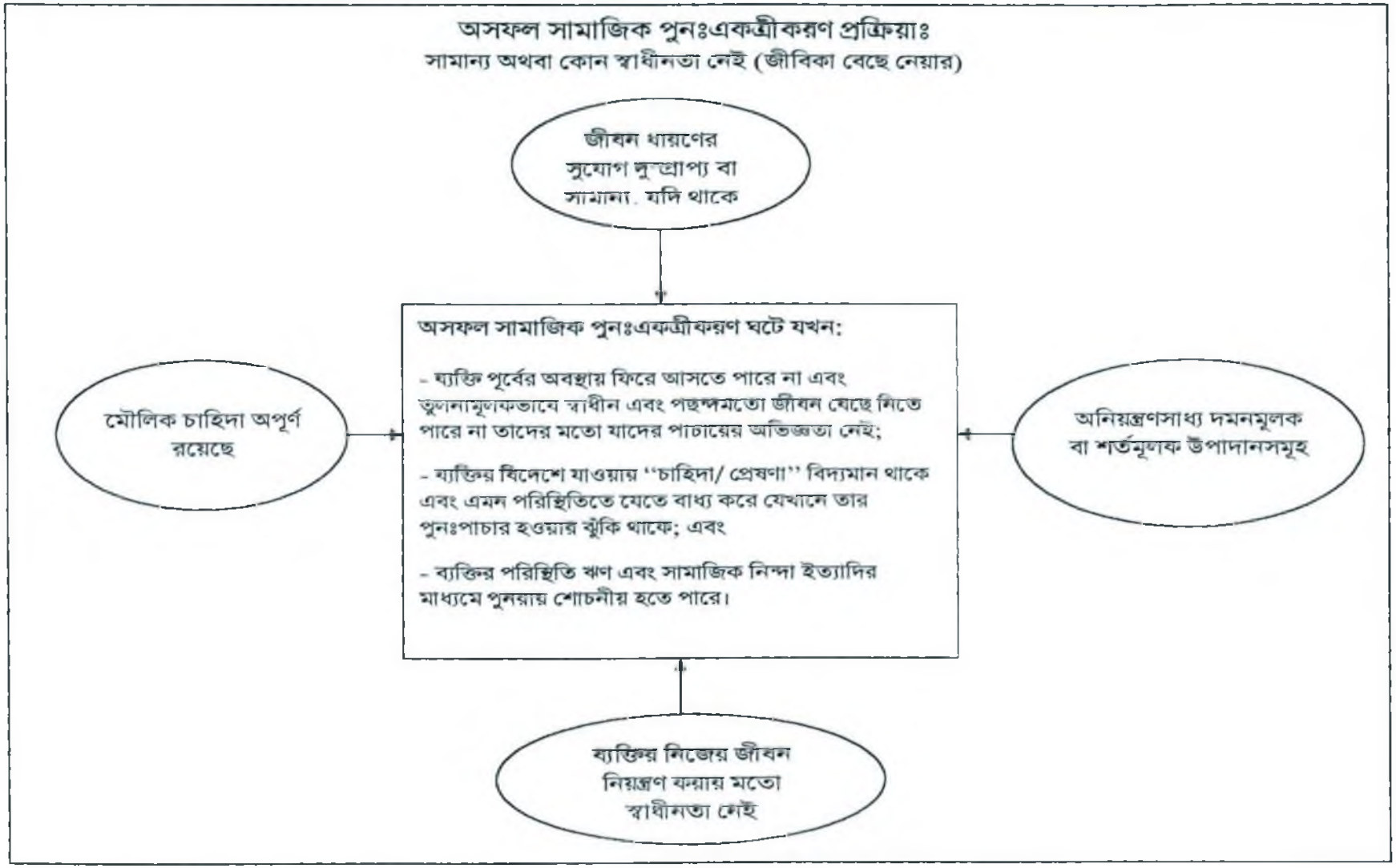

উৎসঃ Revisiting the Human Trafficking Paradigm: The Bangladesh Experience Part 1: Trafficking of Adults- By Bangladesh Thematic Group on Trafficking, IOM, September 2004.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সরকারী উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার পাচার প্রতিরোধ ও পাচার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও সার্বিকভাবে পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন-

১. শিশুদের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (১৯৯৭- ২০০২)-এর অধীনে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ-এর লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল ও পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, শিশুদেরকে নিম্নরূপ বন্ধু সুলভ সহযোগিতা প্রদান-

ক) শারীরিক পুনরুদ্ধারের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান।

খ) নিরাপদ অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে শিশুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অবস্থান করবে। শিশুদের ও বয়স্কদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা।

গ) প্রাথমিক শিক্ষা এবং লাইফ স্কিল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ঘ) বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড।

ঙ) দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

চ) যেসকল শিশুরা নিজ পরিবারে ফিরে যেতে চায় প্রতিষ্ঠা পেতে চায় তাদেরকে যেভাবে সহযোগিতা করা।

উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অংশীদার করেছে।

২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও নরওয়ে উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা (নোরাড)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নভেম্বর ২০০০ সাল থেকে অক্টোবর ২০০৩ সাল পর্যন্ত শিশু উন্নয়ন: শিশু পাচার প্রতিরোধ সমন্বিত কর্মসূচী (সারথি প্রকল্প) বা সিপিসিসিটি শীর্ষক তিন বছরের এক পাইলট প্রজেক্ট সমাপ্ত করেছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য শিশু পাচার প্রতিরোধ, পাচারকৃত শিশুদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ। এ লক্ষ্যে প্রকল্প সীমান্তবর্তী ১৪টি জেলার ২৫টি উপজেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথা- বিডিআর, পুলিশ (সিআইডি), আনসার ও ভিডিপি সদস্যগণ যারা একাজে জড়িত এবং সমাজ সচেতন গোষ্ঠী যেমন- সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মী, এনজিও কর্মী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি ২৫টি উপজেলায় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রস্তাবটি আর বাস্তবায়িত হয়নি।

৩. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্ল্যাগ (PLAGE- Policy Leadership and Gender Equality) খসড়া প্রকল্প হাতে নেয়। পাচার সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান-এর সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দূতাবাসসমূহ ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগীতার লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্প গৃহীত হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আরো কিছু কাজ করছে। যেমন-

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সারথি প্রকল্প ও প্ল্যাগ প্রকল্প ছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্য একটি প্রকল্পের অধীনে তিনটি সেল গঠিত হয়। একটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং অন্য দুইটি ঢাকা ও রাজশাহীতে দু'টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার। এগুলি সার্বিকভাবে সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে কাজ করে। এখানে শুধুমাত্র পাচারকৃত নারীদের জন্য নয় বরং দরিদ্র ঝুঁকিপূর্ণ সকল নারীদের উন্নয়নের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এই সেন্টারের পাচারকৃত নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা, কাউন্সিলিং এবং পুনর্বাসনে দু'টি জাতীয় এনজিও ঢাকার বিএনডাব্লিউএলএ এবং রাজশাহীর এসিডি সহায়তা করে থাকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণলয়

শিশু উন্নয়ন: শিশু পাচার প্রতিরোধ সমন্বিত কর্মসূচী বা সিপিসিসিটি প্রোগ্রাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সহযোগীতায় পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার অধীনে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, পুলিশ, আনসার ভিডিপি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থাগুলির মাধ্যমে পাচারকৃতদের উদ্ধার ও প্রত্যাবসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উক্ত সংস্থাগুলো এনজিওদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের কার্যক্রমকে জোরদার করে থাকে। এছাড়া ২০০৪ সালের জুন মাস থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কয়েকটি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেমন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়-আন্তঃসংস্থার কমিটি গঠন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কমিটি গঠন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে পুলিশ মনিটরিং সেল গঠন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে-এ সংক্রান্ত মামলা মনিটরিং কমিটি গঠন, জেলা পর্যায়ে পুলিশ মনিটরিং সেল গঠন ও জেলা কমিটি গঠন। এসব কমিটি নিয়মিতভাবে বৈঠক করে নারী ও শিশু পাচাররোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই কার্যক্রমকে আরো বেশী গতিশীল ও সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচীর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য হলো-

১. মন্ত্রণালয়/ সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন

২. জনসাধারণের সরাসরি অংশগ্রহণসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং

৩. সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণসহ এনজিও-এর মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী ও শিশু পাচাররোধ সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত সভায় পাচারকৃত নারী ও শিশু উদ্ধার, পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়।

১. পাচারকৃত নারী ও শিশু উদ্ধারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

২. সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সুবিধাভোগীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. নিজস্ব উদ্যোগে সংস্থা কর্তৃক উদ্ধারকৃত পাচারকৃতদের সম্পর্কে থানায় রিপোর্ট করা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছক মোতাবেক এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।

৪. উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুকে বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা যদি সম্ভব না হয় তবে নিকটবর্তী সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে হস্তান্তর করা অথবা এনজিওসমূহের নিজস্ব আশ্রয়কেন্দ্রে (যদি থাকে) রাখা যেতে পারে।

৫. বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে এনজিওসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ সংক্রান্ত সকল ধরণের তথ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছক মোতাবেক সরবরাহ করবে।

৬. পাচারকৃত নারী ও শিশু যাতে পুনরায় পাচারকারীদের খপ্পরে না পড়ে সে লক্ষ্যে তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য এনজিওসমূহ কর্তৃক ফলো-আপ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা,

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে পুনর্বাসিত নারী ও শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান, সুবিধাজনক কর্মে নিয়োগ এবং তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইউনিসেফের সহায়তায় ও সংশ্লিষ্ট এনজিও এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত শিশুদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করা হয়। এই কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ নভেম্বর ২০০৫ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪৩ জন উটের জকিকে প্রত্যাবাসিত করা হয়েছে এবং এদেরকে পুনর্বাসনের জন্য বিএনডাব্লিউএলএ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। উদ্ধারকৃত শিশুদের সমাজে পুনর্বাসিত করাসহ এদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বেসরকারী সংস্থার প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আহ্বান জানায় এবং পুনর্বাসনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া উদ্ধারকৃত শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য দ্রুত বৈধ অভিভাবক সনাক্তকরণসহ সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ এবং ইতোমধ্যে যে সকল শিশুদের পুনঃএকত্রীকরণ করা হয়েছে তাদেরকে নিয়মিত ফলো-আপ করার জন্য বিএনডাব্লিউএলএ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট এনজিওদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়।

তবে সীমান্ত অতিক্রমকারী পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করে থাকে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাচারকৃতদের উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অধিকাংশ সীমান্ত অতিক্রম সম্পর্কিত আলোচনা ও চুক্তি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন সুবিধার জন্য যৌথ উদ্যোগের লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদপ্তরের অধীনে সারা বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ যেকোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করে। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৫.১

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ

নাম	সংখ্যা	স্থান
সরকারী শিশু সদন/শিশু পরিবার	৭৪টি	৬৪টি জেলার প্রত্যেকটিতে একটা করে এবং অন্যান্য নির্বাচনী এলাকায়।
মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতিদার নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র	৬টি	৬টি বিভাগ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশালে একটা করে।
সামাজিক প্রতিবন্ধী মায়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬টি	৬টি বিভাগে একটি করে।
দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	১টি	কোনাবাড়ী, গাজিপুর।
মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র	১টি	চট্টগ্রাম।
কিশোর সংশোধণী প্রতিষ্ঠান	৩টি	গাজীপুর এবং যশোর।
দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠান	১টি	টঙ্গী, গাজিপুর।
সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র	৬টি	৬টি বিভাগে একটি করে।
ছোটমনি নিবাস	৬টি	৬টি বিভাগে একটি করে।
মহিলা সহায়তা কর্মসূচী	৬টি	৬টি বিভাগে একটি করে।

উৎসঃ ডিরেক্টরেট, সমাজ কল্যাণ, আগারগাঁও, ঢাকা।

বেসরকারী উদ্যোগ

বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বিএনডাব্লিউএলএ, সিডাব্লিউসিএস, এসিডি, এ্যাটসেক বাংলাদেশ, রাইটস্ যশোর, উদ্দীপন, সৃজনী, মুক্তি ইত্যাদি জাতীয় এনজিও পাচার বিষয়ে কাজ করছে। এদের প্রধান কার্যক্রমকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

- নারী ও শিশু পাচার বিরোধী কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থাসমূহ দক্ষতার সাথে কাজ করে থাকে।
- তৃণমূল পর্যায়ের দলীয় সদস্যরা জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

জনঅংশগ্রহণঃ

- নারী ও শিশু পাচার বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এনজিওসমূহ জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে।
- জনগোষ্ঠীতে তাদের সহজ বিচরন রয়েছে বলে জনগন সহজেই তাদের কাছে তথ্য প্রকাশ করতে পারে।
- এনজিও নেটওয়ার্ক ব্যবহারের দ্বারা নারী ও শিশু পাচার বিরোধী যেকোন সংবাদ সহজে এবং দ্রুত প্রেরণ করতে পারে।

প্রশিক্ষণঃ

- বিভিন্ন এনজিও পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, পুলিশ, ইউপি সদস্য ও প্রচার মাধ্যমের কর্মীদেরকে পাচারের বিরুদ্ধে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব কতখানি এবং কিভাবে তারা পাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

আইনী সহায়তাঃ

- এনজিওসমূহ পাচারকৃতসহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আইনী সহায়তা দিয়ে থাকে।
- এছাড়া জনগণকে আইন সম্পর্কে সচেতন করে থাকে।

উদ্ধারঃ

- পাচারকারীদের হাত থেকে নারী ও শিশুদের উদ্ধারের কাজেও এনজিওসমূহ অংশগ্রহণ করে থাকে।
- আইন সহায়তা বিভাগের মাধ্যমে এনজিও পাচারকারীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবাসনঃ

- এনজিওসমূহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবসনের কাজও করে থাকে।
- গ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদের খোঁজ নিয়ে এনজিওরা সংশ্লিস্ট মন্ত্রণালয়ে সংবাদ দেয় প্রত্যাবাসনের জন্য।

পুনর্বাসনঃ

- পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- বিভিন্ন এনজিও-এর শেল্টারহোম গুলোয় উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুকে সাময়িক অথবা দীর্ঘস্থায়ী আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়।

নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও কাজ করলেও পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে বাংলাদেশের কয়েকটি এনজিও কাজ করে থাকে। যেমন- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বিএনডাব্লিউএলএ, এসিডি, এসিএসআর, উদ্দীপন, সৃজনী, মুক্তি ইত্যাদি সংস্থা। এদের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বিএনডাব্লিউএলএ এবং এসিডি প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সমগ্র মানব জাতির সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়ন, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীকরণের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ড্যাম) প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের দুঃখ দূর্দশা লাঘব; দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি; বিশেষ করে মেয়ে শিশু ও নারীদের বিরুপ পরিস্থিতি মোকাবেলার তাগিদে মিশন কাজ করে যাচ্ছে। মানবাধিকার লংঘন ও সহিংসতার এক ভয়াবহ রূপ হিসেবে নারী ও শিশু পাচারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে ড্যাম ১৯৯৭ সাল থেকে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ (সিডাব্লিউটিপি) প্রোগ্রাম শুরু করে। এই প্রোগামের অধীনে মিশন পাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। ঢাকা, যশোর ও সাতক্ষীরা এলাকায় এদের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এডভোকেসীর কাজও করে থাকে। আহ্ছানিয়া মিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে এ পর্যন্ত ৯ জন পাচারকৃত নারী ও শিশুকে প্রত্যাবাসিত করা হয়েছে এবং ১৪৪ জনকে পুনঃএকত্রীকরণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, পুনর্বাসনের সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। বর্তমান গবেষণায় সাক্ষাৎকারের জন্য মিশনের ঢাকায় অবস্থিত ট্রানজিটহোম 'সৌরভ' এ ১৫ জন উটের জকি শিশু এবং যশোরে অবস্থিত আশ্রয়কেন্দ্রে ১০ জন পাচারকৃত উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত নারী ও শিশুকে পাওয়া গেছে।

প্রত্যাবাসনঃ

পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন-

১. যৌথভাবে আন্তঃবর্ডার সহযোগীতার লক্ষ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পশ্চিম বাংলার কর্মরত বিভিন্ন সংস্থাসহ বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরের বিভিন্ন এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা।
২. বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা, এনজিও-এর সঙ্গে উদ্ধারকৃতদের সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদান করা।
৩. বাংলাদেশ ও ভারতের দূতাবাস, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে প্রত্যাবাসনমূলক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও ফলোআপ ভিজিট পরিদর্শন করা।
৪. নেপাল ও পাকিস্তানের বিভিন্ন কর্মরত সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

পুনর্বাসনঃ

ঢকা আহ্ছানিয়া মিশন উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের কাজও করে থাকে। পুনর্বাসনের জন্য ড্যাম ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে যশোরে একটি আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া ঢাকাতে মিশনের একটি ট্রানজিটহোম রয়েছে। অনেক সময় প্রত্যাবাসিত ও উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদেরকে প্রথমে ঢাকার ট্রানজিটহোমে রাখা হয়। ট্রানজিটহোমে অবস্থানকালে বৈধ অভিভাবক সনাক্ত করে পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণের চেষ্টা করা হয়। যাদেরক্ষেত্রে অভিভাবক পাওয়া যায় না কিংবা অভিভাবক ফিরিয়ে নিতে আপত্তি করে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য যশোরের আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আবার যশোর সীমান্ত দিয়ে প্রত্যাবাসিত এবং সীমান্ত এলাকায় উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদেরকে সরাসরি যশোর আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়প্রাপ্তদেরকে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে।

১. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।
২. বিনোদনের সুবিধাসহ মানসিক সমর্থন ও কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা।
৩. সাক্ষরতা শিক্ষা প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বিভিন্ন ধরণের কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৫. পরিবার এবং সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থ।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডাব্লিউএলএ)

নারী ও শিশুদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে বিএনডাব্লিউএলএ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের ভেতরে পাচার বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে ১৯৯১ সাল থেকে। বিএনডাব্লিউএলএ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, পুলিশ বাহিনী, আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা প্রকল্প ও অন্যান্য এনজিও-এর সাথে কাজ করে থাকে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, কক্সবাজার ইত্যাদি এলাকায় এদের কার্যক্রম বিস্তৃত। পাচারের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অভিযান, ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার, আইনী সহায়তা, আশ্রয়দান, পুনর্বাসন ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে থাকে বিএনডাব্লিউএলএ। সীমান্ত অতিক্রমকালে কিংবা ভারত, পাকিস্তানে প্রবেশ করার পর পুলিশ অথবা সীমান্তরক্ষী কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুকে সেফকাষ্টডি, জেলসহ বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পাচারকৃতরা অধিকাংশই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তাই এদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সমিতি এসব পাচারকৃতদের দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে একটি স্থিতিশীল পুনর্বাসনের চেষ্টা করে। বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০০৩ এ পরিলক্ষিত হয় ২০০৩ সালে সমিতি ৩৬ জন পাচারকৃত নারী ও শিশুকে কলকাতা, দিল্লি, ও মুম্বাই থেকে প্রত্যাবাসিত করেছে। পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আলাদা কোন তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমান গবেষণায় বিএনডাব্লিউএলএ-এর আশ্রয়কেন্দ্র 'প্রশান্তি'তে ৬ জন পাচারকৃত উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত নারী ও শিশুকে পাওয়া গেছে সাক্ষাৎকারের জন্য।

404150

প্রত্যাবসনঃ

বিএনডাব্লিউএলএ বিভিন্ন দেশের অংশিদার সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সীমান্ত অতিক্রমকারী পাচারকৃতদের সনাক্ত করে। আবার ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের জাতীয়তা সনাক্ত করে যাচাই করার জন্য সমিতিকে দায়িত্ব দেয়। বিএনডাব্লিউএলএ পাচারকৃতের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে প্রত্যাবাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মাধ্যমে পাচারকৃতকে দেশে ফিরিয়ে আনে। এরপর পাচারকৃতের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া বিএনডাব্লিউএলএ পাচারের রুট ও সীমান্ত চিহ্নিত করে উক্ত এলাকায় চালু করেছে লিয়াঁজো দপ্তর যাতে পাচারের পথে অর্থাৎ পাচার হওয়ার সময়ই নারী ও শিশুদের উদ্ধার করা যায়। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও উদ্ধার কর্ম জোরদার করার জন্য পাচারকারীদের জন্য যে কোন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য প্রাপ্তি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমিতি একটি হটলাইন টেলিফোন সার্ভিস চালু করেছে যা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

পুনর্বাসনঃ

প্রত্যাবাসন কিংবা সীমান্ত এলাকায় উদ্ধারের পর পাচারকৃতকে বিএনডাব্লিউএলএ তাদের নিজস্ব আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে প্রথমেই শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা দিয়ে থাকে। সেই সাথে শুরু হয় পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়া। পারিবারিক পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ ছেলে শিশুদের তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয় কিন্তু মেয়ে শিশু ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ফলে এসব মেয়েরা নিজেদেরকে অবহেলিত ও অবাঞ্ছিত ভাবতে শুরু করে এবং আত্মহত্যা বা পুনরায় দুঃসহ জীবনে ফিরে যেতে চায়। এমতাবস্থায় সমিতি এদেরকে কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করে। প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরী দিয়ে, অনেককে বিয়ে দিয়ে পারিবারিক মর্যাদায় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি সামাজিকভাবে তারা যাতে প্রত্যাখ্যাত না হয় সেজন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটা ইতিবাচক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার তোলার চেষ্টা করা হয়।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট (এসিডি)

আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে এসিডি তার কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের তিনটি জেলা- নওগাঁ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে এসিডির কার্যক্রম বিস্তৃত। অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচার বিরোধী কর্মকান্ডও এসিডির একটি অন্যতম ক্ষেত্র। বিভিন্নভাবে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সাথে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত শিশুদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এসিডির প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে দু'টি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে যার একটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের জন্য। বর্তমান গবেষণায় পাচারকৃত উদ্ধারপ্রাপ্ত ৩ জন ছেলে শিশু ও ৩ জন মেয়ে শিশুকে পাওয়া গেছে সাক্ষাৎকারের জন্য।

পুনর্বাসনঃ

সাধারণত সীমান্ত এলাকায় কর্মরত এসিডির কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক কিংবা পুলিশ ও অন্যান্যদের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত শিশুদেরকে (১৮ বছরের নিচে) এসিডির আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসনের জন্য রাখা হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য, চিকিৎসা, মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং, কারিগরি প্রশিক্ষণ,

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদন, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, আইনী সহায়তা ইত্যাদি দেয়া হয়। গতানুগতিক আশ্রয়কেন্দ্র থেকে এসিডির আশ্রয়কেন্দ্র কিছুটা স্বতন্ত্র। এখানকার আশ্রয়প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা অনেক স্বাধীন। এরা আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে স্কুলে লেখা-পড়া করে, বিকেলে তাদের আবাসিক ফ্ল্যাটের বাইরে (এসিডির কার্যালয়ের ভেতরে) নাচ, গান, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিষয়ের প্রশিক্ষণ নেয়। ঈদসহ বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাড়ীতে যাওয়ার সুযোগ পায়। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করার মতো সুযোগ এখানে রয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এখানকার ছেলে-মেয়েরা অনেক বেশী সাবলিল ও জীবনবোধ সম্পর্কে সচেতন। এসিডির আশ্রয়কেন্দ্রে আবাসিক ছেলে-মেয়েরা ছাড়াও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েরা আশ্রয়কেন্দ্র ভিত্তিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন- স্বাস্থ্যসেবা, মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য, স্কুলে যাওয়ার সুযোগ, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পেয়ে থাকে।

সারণি - ৫.২

এসিডির আশ্রয়কেন্দ্র ভিত্তিক সেবাসমূহ (২০০৩ সাল)

কার্যক্রম	শিশুর সংখ্যা
স্বাস্থ্য	৩৬০ জন
মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং	৫১ জন
বিনোদন	৫১ জন
শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক)	১৩ জন
শিক্ষা (অনানুষ্ঠানিক)	৩৮ জন
আইনী সহায়তা	৫ জন
কারিগরি প্রশিক্ষণ	২২ জন

উৎসঃ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩, এসিডি।

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি (এসিএসআর)

সাবেক গার্লস গাইড কমিশনার মরহুম বেগম তাহেরা কবির-এর নেতৃত্বে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ভার্সিটির প্রফেসর, সমাজকর্মী, আইনজীবী এদের সমন্বয়ে ১৯৬৫ সালে সমাজকল্যাণমূলক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন এসিএসআর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কারাবন্দিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক পুনর্বাসন; সামাজিক প্রতিবন্ধী বালিকা ও নৈতিক ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের পুনঃপ্রেষণ (রিমান্ড), নিরাপদ হেফাজত (সেফ কাস্টডি) ও পুনর্বাসন; কিশোর অপরাধীদের পুনঃপ্রেষণ, নিরাপদ হেফাজত, চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি লক্ষ্যে এসিএসআর কাজ করছে। এসিএসআর তত্ত্বাবধানে 'নির্মল আশ্রয়' নামক একটি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে যেখানে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ১২ থেকে ২১ বছরের মেয়েরা আশ্রয় নিতে পারে। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্তদের খাদ্য, বস্ত্র, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বিভিন্ন ধরণের কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন সুবিধা বঞ্চিত মেয়েদের মধ্যে এখানে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত মেয়েরাও আশ্রয়পাপ্ত হয় পুনর্বাসনের জন্য। আলোচ্য গবেষণায় এসিএসআর-এ ৪ জন পাচারের শিকার মেয়েকে পাওয়া গেছে উত্তরদাতা হিসেবে। অন্যান্য আশ্রয়কেন্দ্র থেকে এর কিছুটা বিশেষত্ব এই যে, এখানে ২১ বছর পর্যন্ত মেয়েদের রাখা হয় যেখানে অন্যান্য আশ্রয়কেন্দ্রে ১৮ বছর পর্যন্ত রাখা হয় (ব্যতিক্রম ছাড়া)। আইন ও সালিস কেন্দ্র সহ বিভিন্ন এনজিও এমনকি বিএনডাব্লিউএলএ থেকেও বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের জন্য মেয়েদেরকে এখানে পাঠানো হয়। এখানে গার্মেন্টসসহ অন্যান্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এসিএসআর থেকে এ পর্যন্ত ২০০ জন মেয়েকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসিএসআর-এর আশ্রয়কেন্দ্রটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত।

উপসংহার

পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন একটি দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল প্রক্রিয়া। বিশেষকরে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পাচারকৃত মেয়ে শিশু ও নারীদের পুনর্বাসন করা বেশ কষ্টসাধ্য। এ কারণে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কলা-কৌশল প্রয়োগ ও উদ্যোগের প্রয়োজন তা নেয়া হচ্ছে না। পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হলেও পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগের তুলনায় বাস্তবায়ন অনেক অপ্রতুল। এক্ষেত্রে এনজিওসমূহেরও রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা। যেমন-

শিশুদের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (১৯৯৭- ২০০২) প্রকৃতপক্ষে বাগাড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনা ছাড়া তেমন কিছু বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত শিশু উন্নয়ন: শিশু পাচার প্রতিরোধ সমন্বিত কর্মসূচী (সারথি প্রকল্প) বা সিপিসিসিটি প্রকল্পটি পাচার প্রতিরোধ ও পাচার

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন কিংবা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তেমন মনোযোগী হয়নি। প্রকল্পে প্রস্তাবিত ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ও উদ্ধারপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়নি।

প্ল্যাগ (PLAGE- Policy Leadership and Gender Equality) প্রকল্পে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ অলক্ষ্যে রয়ে গেছে।

বিএনডাব্লিউএলএ পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখলেও পুনর্বাসন ও পুনঃএকত্রীকরণ-এর ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। কারাগারের নিরাপদ হেফাজত কিংবা ভবঘুরে কেন্দ্রে আশ্রিত ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশার দিক বিবেচনায় রেখে বিএনডাব্লিউএলএ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনার উদ্যোগ নিলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত সংস্থাও ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তার অজুহাতে তাদেরকে এক অর্থে বন্দি জীবন-যাপনে বাধ্য করছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সীমিত।

এসিডি শুধুমাত্র শিশুদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু পাচারকৃতদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ নারী, এদের জন্য এসিডির কোন কার্যক্রম নেই।

অতএব প্রতীয়মান হয় যে, পাচারের তুলনায় প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ খুবই নগণ্য এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশুদের তুলনায় আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যাও বেশ অপ্রতুল। ফলে দেখা যায়, উদ্ধারপ্রাপ্তের পরও অনেক সময় নারী ও শিশুদেরকে নিরাপদ হেফাজতের নামে কারাগারে অপরাধীদের মতো বন্দি জীবন কাটাতে হয় দীর্ঘ সময়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া: অধিকার ও বাস্তবতা

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া: অধিকার ও বাস্তবতা

মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক চরমতম রূপ নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, পাচারকৃতদের উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক ও জাতীয় আইন, সনদ ও চুক্তি সম্পাদিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে নারী ও শিশু পাচার রোধ বিশেষ করে পাচারকৃতদের উদ্ধার কিংবা উদ্ধার পরবর্তী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। তবে বেশীরভাগ আইন ও সনদে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের তুলনায় পাচার প্রতিরোধের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আবার প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য গৃহীত স্বল্পসংখ্যক সনদও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন-

আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি

মানবাধিকারের সার্বজনিন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮

(Universal Declaration of Human Rights 1948)

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সনদে প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা, একই কাজের জন্য সমান মজুরী, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, শিক্ষা, দাসত্ব মুক্তি এবং আইনের আশ্রয় নেবার অধিকার বর্ণিত হয়েছে। মানবাধিকার শুধু আইনই নয় মূল্যবোধ সম্পৃক্ত। মৌলিক অধিকার সবার জন্য এবং তা কেউ হরণ করতে পারে না। জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি, দাসত্বমূলক, কম মজুরিতে শ্রমে নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক বিয়ে ইত্যাদির লক্ষ্যে নারী ও শিশু পাচার একটি ক্রমবর্ধমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে যা মানবাধিকারের চরমতম লঙ্ঘন। পাচার মূলত আদি যুগের দাস প্রথারই আধুনিক সংস্করণ। ফলে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের ৪ নং অনুচ্ছেদে দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যকে পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ ও মনুষ্য পাচার দমনের সম্মেলন ১৯৪৯

(Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949)

১৯৪৯ সালে ব্যক্তির পাচার এবং পতিতাবৃত্তিতে প্ররোচিত করার বিরুদ্ধে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৬৯টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। মূলত এটা যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত সম্মেলন। কিভাবে পাচার রোধ ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্যকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিতে পারে এবং পাচারকৃতদের আইনী ও চিকিৎসা সুবিধা দিতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ সে সকল লোককে শাস্তি বিধানের জন্য একমত হয়েছে যারা অন্যের অনুভূতিকে তুচ্ছ বা হেয় করে অন্যকে তার সম্মতি ক্রমেও পতিতাবৃত্তিতে প্ররোচিত করে ও পথ দেখায় এবং সম্মতি সত্ত্বেও কারো পতিতাবৃত্তিকে শোষণ করে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979)

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভবের প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় সিডও (CEDAW) সনদ। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়। বাংলাদেশ ১৯৮০ সালের ৬ নভেম্বর স্বাক্ষর করে। বর্তমানে ১৫০টির অধিক রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষরদান করেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে নারীর গঠনমূলক ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সামাজিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন করা এই সনদের মূল লক্ষ্য। এই সনদের কিছু কিছু ধারা পরোক্ষভাবে নারী পাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। যেমন পরিচ্ছদ ১ এর ৬নং ধারায় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে নারীকে নিয়ে সব ধরণের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আবার পরিচ্ছেদ ৩ এর ধারা-১১ এর ১.গ-তে নারীকে তার পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং চাকুরীর সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবীস হিসেবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার-এর কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯

(Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989)

শিশুদের মানবাধিকার এবং সকল শিশুর জন্য সেসব অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর গৃহীত হয় ইতিহাসের সবচেয়ে সার্বজনীন মানবাধিকার দলিল শিশু অধিকার সনদ। ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর ২০টি রাষ্ট্রের অনুসমর্থনের মাধ্যমে সনদটি কার্যকরী হয়। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট স্বাক্ষর করে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৯২টি রাষ্ট্র সনদটিতে অনুসমর্থন দান করেছে। এই সনদে শিশু পাচাররোধ এবং পাচারকৃত শিশুদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ১১নং অনুচ্ছেদে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে বিদেশে শিশু পাচার এবং বিদেশ থেকে শিশুকে নিজ দেশে ফিরতে না দেয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী অথবা বিদ্যমান চুক্তিগুলোতে শামিল হওয়ার জন্য নির্দেশনা দান করেছে। আবার ৩৪নং অনুচ্ছেদে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে সকল প্রকার যৌন শোষণ ও যৌন নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষায় সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, কোন বেআইনী যৌনকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত করা কিংবা বাধ্য করা; পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্য কোন বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদের শোষণমূলকভাবে ব্যবহার করা; যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোন ক্রিয়াকর্ম বা সামগ্রীতে শিশুদেরকে অপব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ রোধ করতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সকল উপযোগী পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া ৩৫নং অনুচ্ছেদে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে যেকোন উদ্দেশ্যে বা যেকোন ধরণের শিশু অপহরণ, বিক্রয় বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সম্মেলন ১৯৯০

(Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families)

১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সকল অভিবাসি কর্মী ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি চুক্তি গৃহীহ হয়। চুক্তিটিতে অভিবাসি কর্মী ও তাদের পরিবারকে সেই দেশের জনগণের মতো সমান রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদানে এবং অবৈধ উচ্ছেদ রোধে ট্রানজিট এবং গন্তব্য রাষ্ট্রসমূহকে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে এই সনদের কিছু কিছু ধারা পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। ৬৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ দেশান্তর এবং অভিবাসন সম্পর্কে সঠিক পরিমাপ তুলে ধরে ভুল তথ্য নির্দেশনের বিরুদ্ধে কাজ করবে। অভিবাসী কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, হুমকী এসবের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভিয়েনা ঘোষণাপত্র এবং বাস্তবায়নকারী কর্মসূচী ১৯৯৩

(The Vienna Declaration and Programme of Action 1993)

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা ঘোষণাপত্র এবং বাস্তবায়নকারী কর্মসূচী শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভিয়েনা ঘোষণার ৩ নং পরিচ্ছেদের ৩৮নং অনুচ্ছেদে নারীর সমমর্যাদা ও মানবাধিকার প্রসঙ্গে নারী পাচারসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন রোধের কথা বলা হয়েছে।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৫

Beijing Platform for Action 1995

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর (৪-১৫ তারিখ) মাসে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী উন্নয়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত হয় বেইজিং কর্মপরিকল্পনা। উক্ত সম্মেলনে কৌশলগত লক্ষ্য ঘ - ৩ এ নারী পাচার বন্ধ করা এবং বেশ্যাবৃত্তি ও পাচারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিতদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে যে দেশ থেকে নারী পাচার ঘটে, যে দেশের মধ্য দিয়ে পাচার হয় এবং গন্তব্য; সে সকল দেশের সরকার, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের করণীয় সম্পর্কে ১৩০ এর ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ নং ধারায় বর্নিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩০ এর ঘ ধারায় পাচারের শিকার যারা তাদের চিকিৎসা ও সমাজে পুনর্বাসনের জন্য কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি চালু করার জন্য সম্পদ বন্টন করা এবং তাদের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

পাচার প্রতিরোধে জাতিসংঘের নতুন প্রোটকলের নির্দেশনা ২০০১

Guide to the New UN Trafficking Protocol 2001

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালিতে ১৪৮টি দেশের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রের আন্তঃদেশীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ বিরোধী নতুন জাতিসংঘ সম্মেলনে (new UN Convention Against Transnational Organized Crime to States) ১২১টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে এবং এর পরিপূরক ব্যক্তির পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তি (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Specially Women and Children) বিষয়ক খসড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ৮০টি দেশ। প্রোটোকলটি ২০০১ সালে সম্পন্ন হয়। উক্ত প্রোটোকলে পাচারকৃত নারী ও শিশুকে অপরাধী না বলে অপরাধের শিকার বলে মনে করে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। এই প্রোটোকল অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পাচার আন্তর্জাতিকভাবেই প্রতিরোধ করা এবং প্রতিরোধ ও পাচারকারীদের শাস্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েই আইন তৈরীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া যে সকল নারী ও শিশুকে দেশের অভ্যন্তরে পতিতাবৃত্তি অথবা শিশু শ্রমের জন্য পাচার করা হয়, তাদেরকে দেশের বাইরে যাবার প্রয়োজন মনে না করে মূল কনভেনশনের ৩নং অনুচ্ছেদে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ-এর বিষয়ে বলা হয়েছে।

মূল্যায়ন

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে নারী ও শিশু পাচার-এর বিরুদ্ধে গৃহীহ পদক্ষেপসমূহের বেশীরভাগই পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক। শুধুমাত্র শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯-এ ১১নং অনুচ্ছেদে পাচারকৃত শিশুদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতার এবং এ লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বেইজিং পরিকল্পনা ১৯৯৫ এ গৃহীত ঘ- ৩ অনুচ্ছেদের ১৩০ (ঘ) নং ধারায় পাচারের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্মেলনে পাচারকৃত নারি ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। অবশ্য নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের মতে মানবাধিকারের বিভিন্ন সম্মেলনগুলোতে সার্বিকভাবে নারী পাচারের উপরে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি[১৭]।

আঞ্চলিক সনদ ও চুক্তি

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তুলনামূলকভাবে পাচারের হার অনেক বেশী। এ অঞ্চলে পাচারের উৎস রাষ্ট্র এবং গ্রহণকারী রাষ্ট্র উভয়ই বিদ্যমান। ফলে আঞ্চলিকভাবে পাচার বিরোধী আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন সময়ে একত্রিত হয়ে সম্মেলন করে পাচার বিরোধী সনদ ও চুক্তি গ্রহণ করে। যেমন-

আসিয়ান ঘোষণাপত্র ১৯৯৮

ASEAN Declaration 1988

১৯৯৮ সালে গৃহীত নারীর অগ্রসারতা বিষয়ক আসিয়ান ঘোষণাপত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নারীর কার্যকরী ও সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত আসিয়ানের

---

[১৭]. Indrani Sinha, Women's Human Rights, Saga 1997.

Dhaka University Institutional Repository

শিশু বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনার ঘোষণাপত্রে শিশু নির্যাতন, অবহেলা, প্রতারণা ও শিশু পাচারের বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাংকক ঘোষণাপত্র ১৯৯৯

Bangkok Declaration 1999

অনিয়মিত অভিবাসন ও পাচার প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ব্যাংকক ঘোষণাপত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি কাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এশিয় আঞ্চলিক উদ্যোগ ২০০০

২০০০ সালে এশীয় আঞ্চলিক উদ্যোগের ঘোষণায় নারী ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে পাচার বিষয়ক তথ্য ও শিক্ষার কৌশল আবিস্কারের উপর জোর দেয়া হয়।

সার্ক সনদ ২০০২

(SAARC Convention 2002)

২০০২ সালের ৫ জানুয়ারী নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত ১১তম সার্ক সম্মেলনে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ শীর্ষক সনদ গৃহীত হয়। সনদটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০০৫ সালে সার্ক রাষ্ট্রসমূহ অনুসমর্থন দান করে। সার্ক সনদের ৭নং অনুচ্ছেদে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচারকৃতদের পুনর্বাসন এবং প্রত্যাবাসন-এর ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানে সর্বোচ্চ সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ধারা ৯ এ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে পাচারকৃতদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবন করা, সীমান্ত অতিক্রমকারী পাচারকৃতদের অমীমাংসিত প্রত্যাবাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং আইনী পরামর্শ ও স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সরবরাহ প্রাপ্তিসাধ্য করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত আইনী পরামর্শ, কাউন্সিলিং, চাকুরী প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সরবরাহ মঞ্জুর করা এবং এক্ষেত্রে স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদান ও ক্ষমতা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন

সার্কসনদ ব্যতিত অন্যান্য সম্মেলনগুলোতে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধের উপর আলোকপাত করা হলেও পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তবে সার্ক সনদে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বিষয়ে মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। যদিও পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার কথাটি উল্লেখ এর ফলে পাচারের পরিধি ও সংজ্ঞাকে সীমিত করে ফেলা হয়েছে তবুও সার্ক সনদটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাচারকৃত নারী ও শিশু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পাবে।

জাতীয় আইন ও নীতিমালা

নারী ও শিশু পাচারের একটি উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশে পাচারের বিষয়ে আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পাচার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন আইন না থাকায় পাচার বিষয়টাকে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয়েছে। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রণীত হয় যেখানে পাচারকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং পাচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন নতিমালার মাধ্যমেও নারী ও শিশু পাচার বিষয়টিকে মোকাবেলা করার সুযোগ রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, জাতীয় শিশু নীতিমালা ইত্যাদিতে নারী ও শিশুর যে সকল অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে সেগুলো প্রকারান্তে পাচারকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে। কারণ পাচারের মাধ্যমে নারী ও শিশুকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। উল্লেখিত আইন ও নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

উক্ত আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ থেকে আনয়ণ করে বা বিদেশে পাচার করে অথবা ক্রয়, বিক্রয় বা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করে বা তার দখলে বা জিম্মায় রাখে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যূন ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে। অনুরূপভাবে ধারা ৬ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুর ক্ষেত্রেও একইরূপ ঘটনা ঘটায় তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে ধারা-৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতিত কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।

এছাড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ব্যতিত দণ্ডবিধি ১৮৬০, শিশু আইন ১৯৭৪ ইত্যাদি আইনের মধ্য দিয়ে পাচারের মামলা পরিচালনা করা হতো।

বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ২৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে। আবার অনুচ্ছেদ ২৮ (১) অনুযায়ী কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং ২৮ (২) অনুযায়ী রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা; রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা; নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা; নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা; নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখিত হয়।

জাতীয় শিশু নীতিমালা ১৯৯৪

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতিমালা ঘোষণা করে। এ নীতিমালায় শিশুদের আইনগত অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে প্রনীত দেশের বিভিন্ন আইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আইন বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, চাকুরী, শিশু শ্রম, শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়ে শিশু অধিকার ও শিশু স্বার্থ রক্ষায় কার্যকরী।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন

বাংলাদেশের জাতীয় আইন ও নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর প্রত্যেকটিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ পাচারকৃতদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে যা পাচারকার্যকে নিরুৎসাহিত করবে এবং পাচার প্রতিরোধে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং জাতীয় শিশু নীতিমালা নারী ও শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে নারী ও শিশুদের পাচারের ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বাস্তবতা

উপরোল্লিখিত সনদ, চুক্তি ও নীতিমালাসমূহের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেখানে পাচারকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক চরমতম রূপ হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পাচার প্রতিরোধে একমত হয়েছেন। এ লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারী, বেসরকারী সংগঠন সমূহ বেশ কিছুদিন যাবৎ তৎপরতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ পাচার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। পাচার বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা অতি সম্প্রতি বৃদ্ধি পেলেও পাচারের ধারণাটি অনেক পুরনো। ১৯৪৮ সালে গৃহীত মানবাধিকারের সার্বজনিন ঘোষণাপত্রে দাস প্রথা (যার আধুনিকতম ও পরিবর্ধিত রূপ পাচার) নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন ধরণের সনদ, স্বাক্ষরিত হয়েছে নানা চুক্তি ও রচিত হয়েছে বহু নীতিমালা। ফলশ্রুতিতে আশানুরূপ না হলেও পাচার প্রতিরোধে বেশ অগ্রগতি হয়েছে, অন্তত পাচার বিষয়ে জনসচেতনতা পাচারকারীদেরকে কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তুলেছে। পক্ষান্তরে, পাচার বিষয়ক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। সে হিসেবে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে। কিন্তু এসব পাচারকৃতদের মানবাধিকার পুনরুদ্ধার তথা প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তেমন জোরালো আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন কিংবা নীতিমালা গৃহীত হয়নি। আবার যতটুকু গৃহীত হয়েছে ততটুকুও বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আঞ্চলিক আইনসমূহের মধ্যে সার্ক সনদের ৯ নং ধারায় পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ একমত হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন হলেও পাচারকৃতদের দূর্দশা অনেকাংশে লাঘব হতো। নিম্নে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধার ও প্রত্যাবাসন

অপহরণ, নিখোঁজ, কাজের সন্ধানে অদক্ষ নারী ও শিশুদের দেশের বাইরে যাওয়া এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনৈতিক কাজে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের চিত্র থেকে পাচারের যে পরিসংখ্যান অনুমান করা যায় সে হিসেবে উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের সংখ্যা খুবই নগন্য। এক গবেষণায়[১৮] দেখা যায় ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত শিশু নিখোঁজ হয়েছে ৩,৩৯১ জন কিন্তু উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৬৯ জন যা মোট সংখ্যার ২.০৩ শতাংশ, শিশু অপহরণ হয়েছে ৯৮৭ জন কিন্তু উদ্ধার হয়েছে ৪১০ জন যা মোট সংখ্যার ১২ শতাংশ। গত ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে নারী অপহৃত হয়েছে ১২৩ জন এবং পাচার হয়েছে ১,০৭৭ জন। ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩০৬ জন শিশুকে বাংলাদেশের ভিতরে উদ্ধার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ২৩৪ জন পুলিশ কর্তৃক, ৫১ জন স্থানীয় জনগণ কর্তৃক এবং মাত্র ২১ জন বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। একইভাবে দেশের বাইরে ভারতীয় পুলিশ কর্তৃক ৭২ জন, পাকিস্তান পুলিশ কর্তৃক ৩ জন, ডেনিশ পুলিশ কর্তৃক ৯৮ জন এবং দুবাই পুলিশ কর্তৃক ১ জন উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক ১৯৯৮ সালে মাত্র ৩ জন শিশু উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। আবার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানুয়ারী ২০০২ থেকে জুন ২০০৩ পর্যন্ত ৪৪৮১ জন শিশু নিখোঁজ, অপহৃত ও পাচার হয়েছে এবং ৩৪৭ জন নারী অপহৃত ও উদ্ধার হয়েছে ও কতজন নারী নিখোঁজ তা সঠিক জানা যায়নি। আর উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে ১,৪৬৬ জন শিশু এবং ১৩৪ জন নারী। এছাড়া ২,৩৭০ জন নিখোঁজ ও ২২৭ জন পাচারকৃত শিশু এবং ২৪ জন অপহৃত ও ৩৮ জন পাচারকৃত নারী উদ্ধারের বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। নিম্নে সারণির সাহায্যে নারী ও শিশু পাচার, নিখোঁজ, অপহরণ ও উদ্ধারের চিত্র এবং লেখচিত্রের সাহায্যে পাচার ও উদ্ধারের একটা তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

---

[১৮]. Israt Shamim (CWCS); Mapping of Missing, Kidnapped and Trafficked Children and Women: Bangladesh Perspective; Publisher, IOM; 2001.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি - ৬.১

জানুয়ারী ২০০২ থেকে জুন ২০০৩ পর্যন্ত উদ্ধারপ্রাপ্ত নারী ও শিশু

	নিখোঁজ	উদ্ধার	অপহৃত	উদ্ধার	পাচার	উদ্ধার
শিশু	২৪০৫	৩৫	১১০৯	৬৯১	৯৬৭	৭৪০
নারী	জানা নেই	জানা নেই	১২৭	৪০	২২০	৯৪
মোট	২৪০৫	৩৫	১২৩৬	৭৩১	১১৮৭	৮৩৪

[উৎস: প্রফেসর ইসরাত শামীম, "Advocacy campaigns of CWCS to combat Trafficking in Women and Children in the Northern Region of Bangladesh"; National Workshop on-Trafficking in Women and Children Challenges and Strategies, 27 August, 2003]

লেখ চিত্র - ৬.১

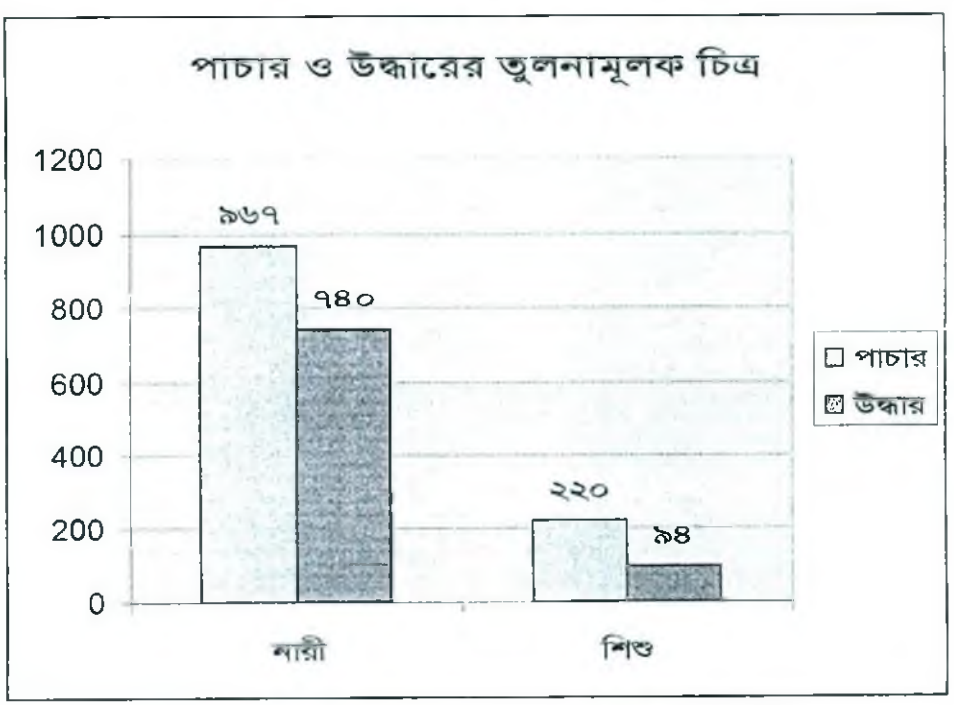

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী হিসেব মতে, গত ১৫ জুন, ২০০৪ থেকে ৯ নভেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছরে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে মাত্র ৩৩৫ জন (১৫৪ জন নারী, ১৭৩ জন শিশু ও ৮ জন পুরুষ) যাদের মধ্যে ৬৫ জন নিজেরাই পালিয়ে এসে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে ২৮৭ জনকে তাদের অভিভাবকরা পুনর্বাসিত করেছে ও ৪৮ জনকে বিভিন্ন এনজিও এবং সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছে[১৯]। এছাড়া ১৪৩ জন উটের জকি শিশুকে প্রত্যাবাসিত করে বিএনডাব্লিউএলএ এবং আহ্ছানিয়া মিশনের আশ্রয়কেন্দ্রে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল যাদের মধ্যে ৯৬ জনকে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের সাক্ষাৎকার নিতে যেয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে এক বছরের বেশী সময় নিয়ে মাত্র ৪১ জন নারী ও শিশুকে পাওয়া গিয়েছে। সর্বমোট ৪৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৬ জন বাংলাদেশ ও ভারতের (কলকাতা) বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত উদ্ধারকৃত পাচারকৃত নারী ও শিশু এবং ২ জন ভারতের বৌবাজার পতিতালয়ের যৌনকর্মী পাচারকৃত নারী রয়েছে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১১ জনকে পাচার হওয়ার পূর্বেই সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যাদের ৩ জন বিডিআর কর্তৃক, ৩ জন স্থানীয় এক কলেজ ছাত্রী কর্তৃক এবং ৫ জন (পুলিশের সহায়তায়) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (মেম্বার) কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৪ জন উটের জকি শিশুকে সৌদি সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্ধার করে প্রত্যাবাসন করে এনেছে। অন্যান্যদের মধ্যে ১২ জন পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে যাদের মধ্যে ৪ জন কর্মস্থল থেকে পালিয়ে আসার পর পুলিশ উদ্ধার করে। ১ জনকে পুলিশের সহায়তায় স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষিকা উদ্ধার করে। এনজিও, মানবাধিকার ও সমাজকর্মী কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় ৩ জন। পাচারকৃতের পরিবারের চাপে ও মামলার ভয়ে পাচারকারী নিজেই ফিরিয়ে এনেছে ১ জনকে। উটের জকি হিসেবে কর্মরত ১ জনকে বয়স বেড়ে যাওয়ার পর উটের মালিক পাচারকারী/পাচারের সহযোগীকে ফেরত দিয়ে দিলে সে দেশে ফিরিয়ে আনার পর পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে দিলে সেখান থেকে শিশুটিকে একটি এনজিও (বিএনডাব্লিউএলএ) নিয়ে এসে আশ্রয় দেয়। ৩ জন ভারত থেকে পালিয়ে দেশে চলে আসার পর এসিডি (এনজিও) তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় দেয় পুনর্বাসনের জন্য। অন্য ২ জন এখনও ভারতের পতিতালয়ে রয়েছে যাদের একজন ৬ বছর ও একজন ১৫ বছর ধরে সেখানে আছে, এখন আর তারা দেশে ফিরতে চায় না। নিম্নে লেখচিত্র ৬.২-এর মাধ্যমে উদ্ধারের চিত্রটি শতকরা হিসেবে দেখানো হলো।

[১৯] বহিরাগমন শাখা- ৪, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১০ নভেম্বর, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র - ৬.২

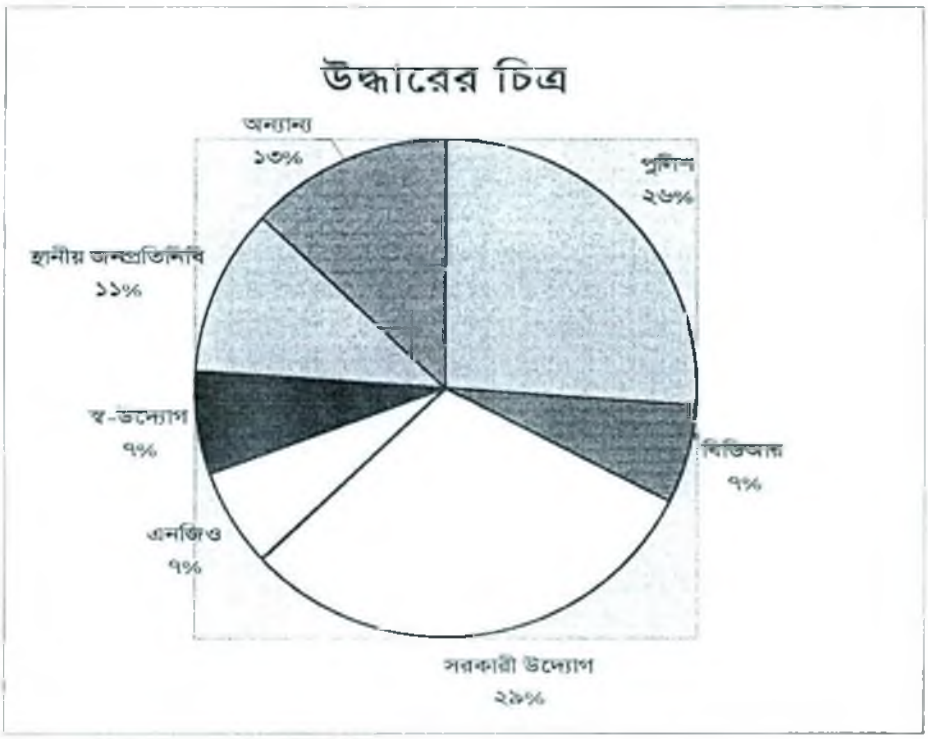

পাচারকৃত এসব নারী ও শিশুদের উদ্ধারের পর প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও রয়েছে দীর্ঘসূত্রিতা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন ভারতের লিলুয়াহোমে আশ্রয়প্রাপ্ত যারা যথাক্রমে ৫ মাস, ২ বছর, ৫ বছর, ৬ বছর ও ৭ বছর ধরে সেখানে আছে কিন্তু আইনগত জটিলতার কারণে তাদেরকে এখনও প্রত্যাবাসিত করা সম্ভব হয়নি।

পুনর্বাসন

উদ্ধার ও প্রত্যাবাসন পর পুনর্বাসনের জন্য বিদেশে কিংবা নিজ দেশের যেসমস্ত আশ্রয়কেন্দ্রে পাচারকৃতদের রাখা হয় সেখানে তারা অন্যরকম মানসিক কষ্টে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায়। পাচারের পর দীর্ঘদিন বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে তাদের অধিকাংশই অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়ে। এছাড়া উদ্ধারের পর বিদেশের আশ্রয়কেন্দ্রে বছরের পর বছর বন্দি থাকার পরও যখন আইনী জটিলতার কারণে নিজ দেশে ফিরতে পারে না তখন তারা মানসিকভাবে আরো ভেঙ্গে পড়ে। আবার প্রত্যাবাসনের পর পুনরায় যখন সঠিক ঠিকানা খুঁজে বের করে পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যভাবে পুনর্বাসনের জন্য দেশের

Dhaka University Institutional Repository

কোন আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয় তখন অধিকাংশেরই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে, বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে।

বর্তমান গবেষণায় ভারতের আশ্রয়কেন্দ্রে যারা আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছে তারা ২ বছর থেকে শুরু করে ৭ বছর পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের আশ্রয়কেন্দ্রে যারা আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছে তারাও (সম্প্রতি প্রত্যাবাসিত উটের জকি ছাড়া) প্রত্যেকে ৩/৪ মাস থেকে শুরু করে ৫ বছর পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের অপেক্ষায়। ৪৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৬ জন বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং ২ জন ভারতের একটি পতিতালয়ে যৌনকর্মী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে যথাক্রমে ৬ বছর ও ১৫ বছর যাবৎ যারা আর এখন দেশে ফিরতে আগ্রহী নয়।

সারণি - ৬.২

উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকাল

স্থান	০-১ বছর	১-২ বছর	২-৩ বছর	৩-৪ বছর	৪-৫ বছর	৫-৬ বছর	৬-৭ বছর	মোট
বাংলাদেশ	২৭ জন	৬ জন	৩ জন	৩ জন	২ জন	০	০	৪১ জন
ভারত	১ জন	১ জন	০	০	১ জন	১জন	১ জন	৫ জন
সর্বমোট	২৮ জন	৭ জন	৩ জন	৩ জন	৩ জন	১ জন	১ জন	৪৬ জন

উল্লেখিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন নারী রয়েছে যারা বাংলাদেশের আহ্ছানিয়া মিশন-এর আশ্রয়কেন্দ্রে ১ মাস যাবৎ অবস্থান করলেও ভারতের আশ্রয়কেন্দ্রে যথাক্রমে ২ বছর, ৩ বছর ও ৪ বছর থাকার পর প্রত্যাবাসিত হয়ে দেশে এসেছে। এখন তারা বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। এর মধ্যে একজন অস্থির হয়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে পাচারকালীন সময়ে অধিকাংশ মেয়েরা শিশু অবস্থায় থাকলেও উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের পর তাদের বেশীরভাগই নারী হয়ে উঠে। কিন্তু আশ্রয়কেন্দ্রের নিয়মানুযায়ী ১৮ বছরের বেশী বয়সী মহিলাদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয় না। ফলে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের একটা বিরাট অংশ পুনর্বাসনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়। অন্যদিকে গ্রহণকারী দেশে ১৮ বছরের উর্ধ্বে পাচারকৃত নারীরা উদ্ধারপ্রাপ্ত হলে তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রের পরিবর্তে

Dhaka University Institutional Repository

জেলের তথাকথিত নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয় কিংবা পাসপোর্ট আইনে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। অনেক সময় এদের খোঁজ আর দেশে কিংবা পরিবারে পৌঁছায় না, বিচারের দীর্ঘসূত্রীতার কারণে তাদেরকে দীর্ঘ সময় এক অসহনীয় কষ্টে কাটাতে হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশের মাটিতে তাদেরকে বিনাদোষে মৃত্যুদন্ডের মতো ভয়াবহ শাস্তি পেতে হয়।

প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের সমস্যা

বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠান যারা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করে এবং কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশী হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন-এর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১. অনেক অল্প বয়সে পাচারের ফলে উদ্ধারপ্রাপ্তের পর অধিকাংশ পাচরকৃতই সময়ের ব্যবধানে তাদের গ্রাম, থানা, জেলার নাম সঠিকভাবে বলতে পারে না। এমনকি তাদের বাবা মায়ের নাম পর্যন্ত ভুলে যায়।

২. যাদের বাড়ী ঘর নেই, এতিম শিশু কিংবা যাদের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না তাদেরকে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয় না।

৩. দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করার ফলে পাচারকৃতরা অনেক সময় তাদের মাতৃভাষাও ঠিকমতো বলতে পারে না আবার যে দেশে পাচার হয়েছে সে দেশের ভাষাও নির্ভুলভাবে বলতে পারে না। ফলে তাদের আসল পরিচয় জানা সম্ভব হয় না অনেকক্ষেত্রেই। এমন বেশ কিছু শিশু ভারতের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে।

৪. অনেক সময় পতিতাবৃত্তিসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনৈতিক কাজ দীর্ঘদিন করার পর নারী ও শিশুরা বিশেষকরে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত মেয়েরা বিভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজের কাজকে মেনে নেয়। তখন আর তারা নিজ দেশে বা পরিবারে ফিরে আসতে চায় না। (বর্তমান গবেষণায় ২ জন উত্তরদাতা রয়েছে যারা বৌবাজার পতিতালয়ে যৌনকর্মী হিসেবে নিয়োজিত, তারা আর দেশে ফিরে আসতে চায় না।)

Dhaka University Institutional Repository

৫. অনেক সময় দেখা যায় ভারতের দূর প্রদেশে কোন বাংলাদেশীর সংবাদ পাওয়া যায় কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বা ফান্ড সংগ্রহ করা কষ্টকর বা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৬. পাচারকারী চক্রের সাথে অনেক সময় উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা বা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে যোগাযোগ থাকে, ফলে পাচারকৃতদের উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনে সমস্যা হয়।

৭. উদ্ধার প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই বলে একাজে অগ্রগতি কম হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ সহায়তা করে।

৮. পাচারকারীরা এতবেশী সক্রিয় থাকে যে, উদ্ধারের পর দেশে ফেরত পাঠানোর পূর্বেই পুনরায় তারা পাচারের শিকার হয়।

৯. প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা বা দীর্ঘসূত্রিতা একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা। প্রথমে আইনগত জটিলতায় কোর্ট থেকে ছাড়া পেতে দেরী হয়, এরপর আবার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জটিলতার কারণে প্রত্যাবাসনে আরো দেরী হয়ে যায়।

১০. বাচ্চাসহ পাচারকৃত নারীরা উদ্ধারপ্রাপ্ত হলে বাচ্চা ও মাকে আলাদা করে ফেলা হয়। মায়েরা পাসপোর্ট আইনে বিচারের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যায় কিন্তু বাচ্চারা পাচারের ভিকটিম হিসেবে আশ্রয়কেন্দ্রে রয়ে যায় বছরের পর বছর। অর্থনৈতিক কারণে বাবা-মায়েরা আর সন্তানদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে না।

১১. যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাচারকৃতদের উদ্ধার করা হয় সেখানেও তাদের নির্ভুল ঠিকানা বা দলিল পাওয়া যায় না যা দ্বারা তাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব সঠিকভাবে প্রমাণ করা যায়।

১২. পাচারকৃতদের নিজস্ব দেশ এবং যে দেশে পাচার হয়েছে, এ দু'দেশের পাচার উদ্ধারে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ যা পাচার উদ্ধারে সহায়ক হয় না।

১৩. পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নিজ এলাকায় ফিরে আসার পর পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় অনেকক্ষেত্রে। বিশেষকরে নারীরা পরিবারে, সমাজে ঠাঁই না পেয়ে আবার ফিরে আসে সেই মানবেতর জীবনে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পাচারের শিকার নারী ও শিশু যারা বিদেশের মাটিতে মানবেতর জীবন-যাপন করছে তারা আমাদের সমাজেরই একটা অংশ। এসব পাচারকৃতের মানবাধিকার পুনরুদ্ধারে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের লক্ষ্যে আরো সুস্পষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য সার্ক সনদসহ অন্যান্য যেসমস্ত আইন ও নীতিমালা রয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

বাংলাদেশ পাচারের একটি অন্যতম উৎস দেশ হিসেবে বিবেচিত। সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকা থেকে নারী ও শিশু পাচার হয়। পক্ষান্তরে গ্রহণকারী দেশসমূহ হচ্ছে- ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর। তবে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী পাচার হয় ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে। পাচারকৃত নারী ও শিশুকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা কিংবা ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ধনী ব্যক্তিরা রক্ষিতা হিসেবেও মেয়েদেরকে ব্যবহার করে থাকে। পর্ণোগ্রাফী, অশ্লীল ছবি, নাইট ক্লাব ও ম্যাসেজ পার্লারে বিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য পাচারকৃত নারী ও শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, জাহাজ ভাঙ্গা, মাদকদ্রব্য, চোরাচালান, উটের জকি, ভিক্ষাবৃত্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার হয়।

বিভিন্ন সূত্রমতে প্রতি বছর গড়ে ২০ হাজার নারী ও শিশু বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমাসে ২০০ থেকে ৪০০ জন নারী ও মেয়ে শিশু শুধুমাত্র পাকিস্তানে যৌনকর্মী হিসেবে নিয়োগের জন্য পাচার হয়। সংবাদপত্রের তথ্যানুসারে ১৯৯২ সালে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার বাংলাদেশী নারী পাকিস্তানের পতিতালয়ে নিযুক্ত ছিল।[২০] গত দশ বছরে ২ লক্ষ নারী ও শিশু পাকিস্তানে পাচার হয়েছে এবং এদের মধ্যে ২ হাজার জন পাকিস্তানের জেল ও বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছে[২১]। আবার এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাচারকৃত নারী ও মেয়ে শিশু ভারতের বিশেষ করে কলকাতা এবং মুম্বাই ও দিল্লীর পতিতালয়ে কাজ করছে। দিল্লীর একটা বস্তিতেই এক লক্ষ থেকে সোয়া লক্ষ বাংলাদেশী বাস করে যারা যৌনকর্মে নিয়োজিত[২২]। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে থেকে পাচার হয়ে এসেছে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে কি পরিমাণ নারী ও শিশু পাচার হয়েছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কারণ এই অনৈতিক কাজটি সংঘটিত হয় অতি গোপনীয়তার সাথে। ফলে পাচারের সঠিক পরিসংখ্যান বের করা বেশ কঠিন কাজ। তবে অনুমানভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান থেকেই নারী ও শিশু পাচারের ভয়াবহতা পরিমাপ করা যায়। পাচারের এই ভয়াবহ অবস্থা উপলব্ধি করে বিভিন্ন জাতীয়,

---

[২০]. Mahfuzur Rahman, Human trafficking: Children and Women are the Worst Victims Bangladesh Must Act Fast to Stop the Scourge, News Network, September 2004.

[২১]. Dr. Ranjana Kumar, Director, Center For Social Research, India; Counter Trafficking in South Asia: SAARC Convention and Way Forward; National Consultation of Stakeholders: Road Map Towards the Implementation of SAARC Convention on Trafficking; 30 November, 2005.

[২২]. কলকাতার এনজিও 'সংলাপ' কর্তৃক ইউনিসেফের সহায়তায় যৌনকর্মীদের উপর একটি গবেষণা- ১৯৯৭-৯৮ থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক ও মানবাধিকার সংস্থা তথা বিশ্ব জনমত পাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং পাচার প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে। ফলে আশানুরূপ না হলেও পাচার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। কিন্তু পাচার প্রতিরোধ সত্ত্বেও কিংবা প্রতিরোধের পূর্বেই যেসকল নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়েছে সেসকল পাচারকৃত নারী ও শিশু বিদেশের মাটিতে কি অবস্থায় আছে, কতখানি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে সেদিকে আমাদের মনোযোগ খুবই সামান্য। আমাদের সমাজের একটা বিরাট অংশ পাচারকৃত এবং তাদের পরিবার এক দূর্বিষহ, মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এদের জরুরী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমাদের নীতি-নির্ধারক এবং মানবাধিকার কর্মীদের আরো তৎপর হওয়া উচিৎ।

পাচারকারী চক্রের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ও সক্রিয় প্রভাবের ফলে পাচারকৃতদের উদ্ধার করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আবার বিভিন্ন আইনের প্রায়োগিক জটিলতা ও অপ্রতুলতার কারণে বিদেশে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় দেখা দেয় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রীতা। এমনকি অনেক সময় প্রত্যাবাসন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অপরাধী পাচারকারীর পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত পাচারকৃতরাই শাস্তি ভোগ করে। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে যেসকল পাচারকৃত নারী ও শিশুদেরকে উদ্ধার ও প্রত্যাবাসিত করা হয় তাদেরকে পুনর্বাসন করা বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া আবার কন্টকাকীর্ণ হয়ে পড়ে। পাচারের ফলে নারী ও শিশুর মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্রে প্রচন্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। পাচার এবং পাচার পরবর্তী সময়ে অনেকক্ষেত্রে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হয়ে অনেকেই অবৈধ গর্ভধারণ করে। তাছাড়া বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ যেমন- এইচ,আই,ভি/ এইডস, হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। তাছাড়া দেখা যায় যে, অনেকক্ষেত্রে পাচার-এর পর পরই কোনরূপ ক্ষতির শিকার হওয়ার আগেই পাচারকৃত নারী ও শিশুকে উদ্ধার করা হলেও উদ্ধারের পর বিদেশে আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসার পর সমাজের লোক তাকে 'নষ্টামেয়ে', 'কলঙ্কিত' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে। তাই উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের পরও পাচারকৃত নারী ও শিশুর পক্ষে সমাজে বসবাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ না পেয়ে পুনরায় তারা ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হয় এবং পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যায়। কেউকেউ আবার হতাশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেকক্ষেত্রে পাচরকৃতদের উদ্ধারের পর প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ হতে এত দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে যায় যে তখন পাচারকৃত বেঁচে থাকার মতো মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং পাচার প্রতিরোধের পাশাপাশি পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জরুরী উদ্যোগের প্রয়োজন। প্রয়োজন উদ্ধারের গতিকে ত্বরান্বিত করে প্রত্যাবসন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে ভারত, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বাংলাদেশী অসহায় পাচারকৃত নারী ও শিশু প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে নীতি-নির্ধারক ও সচেতন মানব সমাজের দিকে।

সুপারিশমালা

প্রত্যাবাসনের জন্য সুপারিশঃ

সীমান্ত অতিক্রমকারী পাচারকৃত নারী ও শিশুদের প্রত্যাবাসনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহের আশু বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যাবসনের ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ নিম্নে দেয়া হলো।

- প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সার্ক সনদসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত চুক্তি বা পদক্ষেপসমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে কাজ করতে হবে।

- পাচারের আধিক্য দেশ অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন তৈরী করতে হবে।

- প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজতর করার জন্য গ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে আইনের প্রায়োগিক জটিলতা নিরসন করতে হবে।

- গ্রহণকারী দেশে উদ্ধারপ্রাপ্ত জেলে অথবা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুদের সংবাদ দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন গ্রহণকারী দেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

- বিদেশে পাচারকৃতদের উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে একটি যৌথ আঞ্চলিক তহবিল গঠন করতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে উদ্ধারকার্য ব্যহত না হয়।

- মধ্যপ্রাচ্যসহ যেসমস্ত দেশে অদক্ষ নারী শ্রমিকের প্রয়োজন রয়েছে সেসমস্ত দেশের সাথে বৈধ অভিভাবাসনের চুক্তি করতে হবে এবং দেশে বিদ্যমান নারী শ্রমিকের অভিবাসনের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়াসহ অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে হবে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত অদক্ষ নারী শ্রমিকদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গ্রহণকারী দেশের সরকারের সহায়তায় বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত নারী ও শিশু শ্রমিকদের মধ্যে যারা দেশে ফিরে আসতে চায় তাদের ক্ষতিপুরণসহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যারা কাজ করতে চায় তাদেরকে শ্রম আইন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় সরকারসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যাবসনের কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

- সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইত্যাদি একত্রিত হয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সেমতে কাজ করে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারে।

- আদমশুমারীর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত নারী ও শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যান বের করে তারা কোন্ কোন্ দেশে অবস্থান করছে তা বের করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে প্রত্যাবাসনের পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে।

- প্রত্যাবাসনের সুবিধার্থে পাচারকৃতদের পরিসংখ্যান, পাচারের পথ, পদ্ধতি, গন্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে এনজিওসমূহ সরকারকে সাহায্য করবে।

- গ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন এনজিও-এর সাথে আমাদের দেশের এনজিওদের সুস্পর্ক ও সক্রিয় নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

- সর্বোপরি প্রত্যাবাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও এনজিওদের একত্রে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এনজিওসমূহকে সরকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এনজিওসমূহ সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বাসনের জন্য সুপারিশঃ

উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের পর পাচারকৃত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পাচারকৃত নারী ও শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু ও নারীদেরকে পুনর্বাসন করা একটি কঠিন ব্যাপার। সমস্যা সত্ত্বেও পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকরী করা তথা সমাজে পাচারকৃতদের গ্রহণযোগ্য অবস্থান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- উদ্ধারপ্রাপ্ত ও প্রত্যাবাসিত পাচারকৃতরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং এই নিরাপত্তাহীনতার কারণে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সীমিত কিংবা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং পাচারকৃতদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

- সার্ক সনদসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত চুক্তি বা পদক্ষেপসমূহের সফল বাস্তবায়ন করতে হবে।

- পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের জন্য আরো অধিক সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার পরিচালনায় আশ্রয়কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

- পাচারকৃতদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহের গুনগত মান বাড়াতে হবে। অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়পাপ্ত নারী ও শিশুরা নিয়মের বেড়াজালে বন্দি অবস্থায় এক অনিশ্চিত জীবন-যাপন করে। পাচারকৃতদের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে যে তারা আশ্রয়কেন্দ্রে নিজেদের জীবন গঠনের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে অবস্থান করতে এসেছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক পুনঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আরো অধিক পরিমাণে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহকে সরকার সহায়তা করবে।

- আশ্রয়কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ শেষে পুনঃএকত্রীকরণের পর স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য পাচারকৃতদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- পাচারকালীন সময়ে অধিকাংশই শিশু থাকে অর্থাৎ তাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে থাকে কিন্তু উদ্ধারপ্রাপ্ত কিংবা প্রত্যাবাসিত হতে হতে তারা নারীতে পরিণত হয় অর্থাৎ ১৮ বছরের বেশী হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রের নিয়মানুযায়ী ১৮ বছরের উর্ধ্বে কাউকে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা যায় না। তখন তাদেরকে জেলে তথাকথিত নিরাপত্তা হেফাজতে কষ্টকর জীবন-যাপন করতে হয়। বিশেষ করে প্রত্যাবাসনের পুর্বে বিদেশে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশী দেখা যায়। এসব নারীরা বিদেশের জেলে এক মানবেতর জীবন-যাপন করে এবং অনেকক্ষেত্রে উল্টো শাস্তিভোগ করে। তাই পাচারকৃত বা প্রতারিত যে কোন বয়সের নারী ও শিশুকে আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার নিয়ম করতে হবে। এ ব্যাপারে গ্রহণকারী দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহৃত জেলখানার নিরাপত্তা হেফাজতসমূহের সংস্কার সাধন করে মানসিক ও শারীরিকভাবে নাজুক পাচারকৃতদের থাকার উপযোগী করে তুলতে হবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের কেইসগুলোর দ্রুত মিমাংসা করতে হবে। কেইস চলাকালীন সময়ে পাচারকৃতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তার পছন্দমতো স্থানে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তার নামে যেন তাকে বন্দিদশায় পাচারের মতোই কষ্টকর জীবন যাপন করতে না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

- পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তহবিল গঠন করতে হবে যেন অর্থের অভাবে পুনর্বাসন কার্যক্রম ব্যহত না হয়।

- বিদেশে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃতদের মধ্যে যারা দেশে ফিরে আসতে চায় না তাদের জন্য বিদেশেই আশ্রয়কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণ দিয়ে যথাপোযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে উভয় দেশের সরকারের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বা সমঝোতার ব্যবস্থা করতে হবে।

- আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক অপ্রতুলতার বাস্তব চিত্র আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার কাছে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান ও প্রশিক্ষণ সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে পাচারকৃতদের সামাজিক ও পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের উচ্চমহল থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং এনজিওসমূহকে একত্রে কাজ করতে হবে।

- পাচারকৃতদের পুনর্বাসন-এর লক্ষ্যে কর্মরত এনজিওসমূহকে সরকারীভাবে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্মীদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায়।

- সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও এনজিওসমূহ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে সহজ ও আধুনিকীকরণ করতে পারে।

- পুনর্বাসনের আবশ্যকীয় অংশ হিসেবে পাচারকৃতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক পুনঃএকত্রীকরণের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুষ্ঠু ফলোআপের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- সর্বোপরি সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিও তথা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা পারস্পরিক সহযোগীতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

গ্রন্থ:

১. ক্যারিন হেইসলার, বাংলাদেশী শিশুদের ওপর যৌননিপীড়ন ও যৌনশোষণ মোকাবিলার লক্ষ্যে কার্যকর অনুশীলন এবং অগ্রাধিকার বিষয়ক পটভূমি প্রতিবেদন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০১।

২. বেলা বন্দোপাধ্যায়, মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও নারী ও শিশু পাচার, জানুয়ারী ২০০২।

৩. মানুষ নিয়ে বেচাকেনা : বাংলাদেশ থেকে নারী পাচার ও শিশু পাচার, সম্পাদনা- ফরিদা আখতার ও সীমা দাস সীমু, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

৪. Mahfuzur Rahman, Human Trafficking: Children and Women are the Worst Victims Bangladesh Must Act Fast to Stop the Scourge, News Network, September 2004.

৫. Tasneem Siddiqui, TRANSCENDING BOUNDARIES Labour Migration of Women from Bangladesh, UPL, 2001.

৬. On the Margin Refugees, Migrants and Minorities, edited by Chowdhury R Abrar, June 2000.

৭. "Gender Dimensions in Development Statistics of Bangladesh", Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning and Technical Assistance for Gender facility And Institutional Support for Implementation of the National Action plan Project, Ministry of Women and Children Affairs, 1999.

৮. Indrani Sinha, Women's Human Rights, Saga, 1997.

৯. Violence against Women in Bangladesh- 2000, 2001, 2002 & 2003; editor Salma Ali; Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA).

Dhaka University Institutional Repository

১০. Gender Equality in Bangladesh: Still a Long Way to Go, Edited by Shahiduzzaman & Mahfuzur Rahman, News Network, November 2003.

১১. Nusrat Ameen, Wife Abuse in Bangladesh: An Unrecognised Offence, The University Press Limited, 2005.

পুস্তিকা:

১. "প্লাটফরম ফর অ্যাকশন", টেকনিক্যাল এ্যাসিস্টেন্স ফর জেন্ডার ফ্যাসিলিটি এ্যান্ড ইনিষ্টিটিউশনাল সাপোর্ট ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্লান প্রজেক্ট, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২. আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ; সম্পাদনা- সুলতানা কামাল, ডিরেক্টর অ্যাডভোকেসি এ্যান্ড কমিউনিকেশন; গবেষণা ও গ্রন্থনা- জাকিয়া আফরিন, ল' রিভিউ; আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক); জুন ১৯৯৮।

৩. ইসরাত শামীম ও খালেদা সালাহউদ্দিন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ করুন, সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ, মে ২০০১।

৪. বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, 'আসুন নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ করি', রাইটস্ যশোর, নভেম্বর ২০০১।

৫. "Plan of Action to Combat Trafficking & Commercial Sexual Exploitation", Department of Women & Child Development, Ministry of Human Resource Development, Government of India, 1998.

৬. Sexual Exploitation of Children in Bangladesh, editor Salma Ali, Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA), December 2001.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পত্র:

১. Natasha Ahmed, In Search of Dreams: Study on the Situation of the Trafficked Women and Children from Bangladesh and Nepal to India, IOM, August 2001.

২. M.Shamsul Islam Khan, Trafficking of Women and Children in Bangladesh: An Overview, ICDDRB, 2001.

৩. Therse Blanchet, "DOING BIDESH" The Cross border labour migration and trafficking of women from Bangladesh, U.S AED, November 2003.

৪. Ishrat Shamim, Mapping of Missing, Kidnapped and Trafficked Children and Women: Bangladesh Perspective, IOM, 2001.

৫. A Research on Prostitution: An Unresolved Social Issue Dew to Incomprehensive Nature of Suppression of Immoral of Traffic Act-1933, editorial board-Zabunnessa Rahman, Salma Ali, Shafiqul Hassan; Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA), 1999.

৬. Hillah Marriage: Humiliation of Muslim Women Under Fundamentalism, edited by Salima Sarwar, Association for Community Development-ACD, Rajshahi, January 2003.

৭. Types, Nature and Causes of Violence Against Women in Rajshahi District; edited by Salima Sarwar; Association for Community Development (ACD), Rajshahi; September 2004.

৮. Adolescent Prostitute: Commercial Sexual Exploitation of Children; Conducted by Ms Salima Sarwar (Ashoka Fellow), Director, ACD & Sadikur Rahman (Research Fellow, IER, R.U.); Association for Community Development (ACD), Rajshahi; September 2004.

Dhaka University Institutional Repository

৯. The Counter Trafficking Framework Report: Bangladesh Perspective, Ministry of Women and Children Affairs, February 2004.

১০. Revisiting the Human Trafficking Paradigm: The Bangladesh Experience Part 1: Trafficking or Adults – By Bangladesh Thematic Group on Trafficking, IOM, September 2004

সেমিনার/ ওয়ার্কসপ রিপোর্ট:

১. Prof. Ishrat Shamim (President, CWCS), "South Asian Scenario and the Road Map Towards the Implementation of the SAARC Convention on Trafficking", National Consultation of Stakeholders: Road Map Towards the Implementation of the SAARC Convention on Trafficking, 30 November 2005.

২. Dr. Ranjana Kumari (Director, Centre for Social Research, New Delhi), "Counter Trafficking in South Asia: SAARC Convention and Way Forward", National Consultation of Stakeholders: Road Map Towards the Implementation of the SAARC Convention on Trafficking, 30 November 2005.

৩. International Conference on Inter-Relation Between Trafficking in Women & Children and HIV/AIDS, Organized by Bangladesh National Women Lawyers' Association with the financial support of American Center on 24 and 25 July 2003.

৪. খন্দকার রেজওয়ানুল করিম ও শাহজাদা এম আকরাম, Trafficked Women: Transformation of Levels of Their Vulnerabilities"; National Seminer on- Women in Challenging Situation in Bangladesh, Organized by Refugee and Migratory Movements Research Unit in collaboration with The British Council, 24 July, 2003.

৫. প্রফেসর ইসরাত শামীন, "Advocacy Campaigns of CWCS to Combat Trafficking in Women and Children in the Northern Region of Bangladesh" ; National

Dhaka University Institutional Repository

Workshop on - Trafficking in Women and Children Challenges and Strategies, 27 August, 2003.

৬. Report on Regional Consultation on NGO Partnership in Rescue & Rehabilitation of the person affected by Human Trafficking in South Asia, 24-25 July 2002, Organised by Prayas, Delhi.

৭. "Rapid Assessment on Trafficking in Children for Exploitive Employment in Bangladesh", By Incidin Bangladesh for ILO, Feb 2002.

৮. Organize Against Trafficking – A Sanlaap Appeal for building resistance against trafficking in person.

৯. রেফুউজি এ্যান্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু) কর্তৃক প্রণীত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল (২০০২)।

১০. ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)-এর নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (২০০২)।

বার্ষিক প্রতিবেদন:

১. Annual Report – 2003, Bangladesh National Women Lawyers' Association (BNWLA).

২. Annual Report – 2002-'03, Dhaka Ahsania Mission.

৩. Annual Report – 2003, Association for Community Development (ACD).

৪. Annual Report – 2004, Association for Correction and social Reclamation (ACSR).

Dhaka University Institutional Repository

নিউজ লেটার/বুলটিন:

১. UDBASTU, Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU); Issue 21, July–September 2002; Issue 28, April-June 2004; Issue 29, July-September 2004 & Issue 32, April-June 2005.

২. খাদিজা বিলকিস, "পাচাররোধে প্রচারণা", এ্যাটসেক বার্তা, সংখ্যা- ০৩, এপ্রিল-জুন ২০০২।

৩. COMBAT, News Letter on Trafficking in Women and Children, Edited by Nusrat Sultana, Mahbuba Nasreen, & Ishrat Shamim, June – August 2003, October 2001 – January 2003.

৪. এসিডি নিউজ লেটার, বর্ষ - ৩, সংখ্যা - ৮, এপ্রিল - জুন ২০০২।

৫. বুলেটিন, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, মার্চ - ১৯৯৯।

৬. সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, "ফ্যাক্ট ফাইন্ডার", রাইটস্ যশোর, জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী ২০০৪, জুলাই - আগস্ট ২০০২, মার্চ - এপ্রিল ২০০২।

৭. "Letter from BNWLA", Chief Editor, Advocate Salma Ali, Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA), September 2002.

৮. "Movement against Trafficking and Sexual Exploitation", Chief Editor, Advocate Salma Ali, Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA), October Special Bulletin, 2001.

৯. নিউজ লেটার, সম্পাদক, এ্যাডভোকেট সালমা আলী, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, জুন ২০০১।

১০. Women's Walk, A journal of the Women's Economic Empowerment Project, Editor, Dewan Mahmudal Haque, Bangladesh National Women Lawyers Association, December 2000.

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ:

১. মোকাম্মেল হোসেন, শিশু শ্রমিক: অনিশ্চিত গন্তব্যের অসহায় অভিযাত্রী, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, এপ্রিল - জুন ২০০১।

২. আফরিনা বিনতে আশরাফ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, মার্চ-এপ্রিল ২০০৪।

৩. Rahima Akter, "Discussion on Rescue and Rehabilitation of Victims of Trafficking in Women and Children in Bangladesh", Term Paper, M. Phil Program, Session 2000 – 2001, International Relations Department.

৪. "Honolulu Commitment on: Mobility, Trafficking, and HIV/AIDS in South Asia", UDBASTU – a news letter on Refugee and migratory Movements, Issue 21, July – September 2002, Page 11-12.

সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি:

১."Children Trafficking: Bangladesh, Nepal top South Asian Table" The Daily Star, 26 January, 2004.

২."প্রসঙ্গ নারী ও শিশু পাচার"- সম্পাদকীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪।

৩. "পাঞ্জাব - হরিয়ানা - মহারাস্ট্রে পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ - আসাম - ত্রিপুরার মেয়েরা", দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ অক্টোবর ২০০৩।

৪. ফরিদা ইয়াসমিন, "দুবাইয়ে উটের জকি: বাংলাদেশে পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক সক্রিয়", দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ২০০৪।

৫. নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে দক্ষিণ এশিয় কর্মশালা: আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ জানুয়ারী ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ঢাকা বিমান বন্দর দিয়ে শিশু ও নারী পাচারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

৭. "20,000 Bangladeshi Women, children smuggled a year", The Daily Star, 21 January 2004.

৮. "14 abducted for camel jockeying return home", The Daily Star, 05 October 2004.

৯. "৩২ বছরে ১০ লাখ নারী ও শিশু পাচার", দৈনিক দিনকাল, ০১ এপ্রিল ২০০৪।

১০. "কক্সবাজারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত: দরিদ্র আর অসচেতনতার কারণে শিশু পাচার হয়", দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারী ২০০৪।

১১. "খুলনার সাংস্কৃতিক দলের অন্তরালে নারী ও শিশু পাচার অব্যাহত", দৈনিক সংগ্রাম, ২০ মার্চ ২০০৪।

১২. মাহমুদুল হক, "শিশু পাচার এবং হাইকোর্টের সুয়ামাটা রুল", দৈনিক বাংলাবাজার, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

১৩. মিজানুর রহমান তোতা, "দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পথে নারী ও শিশু পাচার বৃদ্ধি", দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারী ২০০৪।

১৪. সালমা আলী, "বিভিন্ন কারণে নারী পাচার বন্ধ হচ্ছে না", দৈনিক যুগান্তর, ১৪ জানুয়ারী ২০০৪।

১৫. "যশোরের শাখারীপোতা গ্রাম নারী পাচারকারীদের আস্তানা গড়ে উঠেছে", বাংলাবাজার, ২৫ নভেম্বর ২০০৪।

১৬. শ্যামল সরকার, "হজ্বের নামে বছর বছর মানুষ পাচার", প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০০৪।

১৭. সিরাজুল হাসান, পারভেজ বাবুল, "নারী ও শিশু পাচার কমছে না", যুগান্তর, ১৪ জানুয়ারী ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১

আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত নারী ও শিশুর (পাচারের পর উদ্ধারকৃত) সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

সাক্ষাৎকার দানকারী সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলীঃ

নামঃ

বয়সঃ লিঙ্গঃ

বৈবাহিক অবস্থাঃ
১. বিবাহিত
২. অবিবাহিত
৩. বিধবা
৪. স্বামী পরিত্যাক্তা
৫. আলাদা থাকে
৬. অন্যান্য

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ
১. নিরক্ষর
২. স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন
৩. প্রাথমিক
৪. মাধ্যমিক
৫. উচ্চ মাধ্যমিক
৬. স্নাতক
৭. স্নাতকোত্তর

স্থায়ী ঠিকানাঃ

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীতে যাদের সাথে থাকতেনঃ

১. স্বামী ও সন্তান
২. বাবা-মা, ভাই-বোন
৩. আত্মীয়ের সাথে
৪. ভাইদের সংসারে
৫. ছেলের সংসারে
৬. অন্যান্য

পরিবারের আয়কারী সদস্যঃ

১. বাবা
২. মা
৩. ভাই
৪. বোন
৫. ছেলে
৬. মেয়ে
৭. নিজে
৮. অন্যান্য

পরিবারের আয়ের উৎসঃ

১. চাকুরী (কি ধরনের)
২. ব্যবসা (কি ধরনের)
৩. নিজ জমিতে চাষাবাদ
৪. অন্যের জমিতে চাষাবাদ
৫. বর্গাচাষ
৬. শ্রমিক (কি ধরনের)
৭. অন্যান্য

মাসিক আয়ঃ

১. <১০০০ টাকা
২. ১০০০ - ২০০০ টাকা
৩. ২০০০ - ৩০০০ টাকা
৪. ৩০০০ - ৪০০০ টাকা
৫. ৪০০০ - ৫০০০ টাকা
৬. ৫০০০ - ৬০০০ টাকা
৭. >৬০০০ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

পাচার সম্পর্কে তথ্যাবলীঃ

১.আশ্রয়কেন্দ্রে কতদিন ধরে আছেন?

২. কোথা থেকে এসেছেন?

৩. এখানে কিভাবে এসেছেন?

৪. ওখানে কেন গিয়েছিলেন?

১. কাজ করতে
২. স্বামীর কাজ উপলক্ষ্যে
৩. বেড়াতে
৪. প্রেমিকের সাথে ঘর বাধাঁর জন্য
৫. অন্যান্য

৫. কার সাথে গিয়েছিলেন?

১. পরিবারের সদস্যদের সাথে
২. অন্য আত্মীয়ের সাথে
৩. প্রতিবেশীর সাথে
৪. স্বামীর সাথে
৫. একা দালালের সাথে
৬. প্রেমিকের সাথে
৭. অপরিচিত লোকদের সাথে
৮. অন্যান্য

৬. কিভাবে গিয়েছিলেন? (কি ধরনের যানবাহন ব্যবহৃত হয়েছিল)

৭. কত ঘন্টা/ দিন সময় লেগেছে যেতে?

৮. পথে কোন সমস্যায় পড়েছিলেন?

১. হ্যাঁ ২. না

Dhaka University Institutional Repository

৯. কি ধরনের সমস্যা হয়েছিল?

১০. দলের সাথে গিয়ে থাকলে দলে কতজন ছিলেন?

১১. কখন বুঝলেন যে আপনি পাচার হয়েছেন?

১২. পাচারকারীরা দলে কতজন ছিল?

১৩. (বিবাহিতা হলে) সাথে সন্তান ছিল কি?

১. হ্যাঁ ২. না

১৪. ক. সন্তান সাথে নেওয়ার জন্য আলাদা টাকা দিতে হয়েছিল কি?

১. হ্যাঁ ২. না

খ. কত টাকা দিতে হয়েছিল?

১৫. সন্তানের কি ঘটলো?

১৬. কোন পথে এসেছিলেন? কোথায় কোথায় থেমেছিলেন?

১৭. দিন/ রাতের কোন সময় সিমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন?

১৮. সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা কি ছিল?

১. সরাসরি জড়িত ছিল

২. ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল

৩. অন্যান্য

১৯. পাচার হওয়ার পর কতদিন অন্য দেশে ছিলেন?

২১. ওখানে কি কাজ করতে হয়েছিল?

Dhaka University Institutional Repository

২২. কিভাবে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন?

২৩. বিদেশে জেলে/ আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে হয়েছিল কি-না? (থাকলে কতদিন ছিলেন)

২৪. দেশে ফিরে আসতে কোন সমস্যা হয়েছিল কি-না?

১. হ্যাঁ ২. না

২৫. কি ধরনের সমস্যা হয়েছিল?

২৬. বর্তমানে আশ্রয় কেন্দ্রে কেমন আছেন?

২৭. এখানে কি ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন?

২৮. বাড়ীতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে কি-না?

১. হ্যাঁ ২. না

২৯. পরিবারে ফিরে যাওয়ার জন্য এই সংস্থা থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

৩০. প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? (প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন ব্যাখ্যা করতে হবে)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

পাচারের বিরুদ্ধে গৃহীত সনদ ও চুক্তিসমূহ

নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় পাচারোধ এবং পাচারকৃতদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় আইন, সনদ ও চুক্তিসমূহ।

আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি

মানবাধিকারের সার্বজনিন ঘোষণাপত্র ১৯৪৮
(Universal Declaration of Human Rights 1948)

অনুচ্ছেদ -৪

- কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বে রাখা চলবে না, সকল প্রকার দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

অন্যকে পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ ও মনুষ্য পাচার দমনের সম্মেলন ১৯৪৯
(Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949)

উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ সে সকল লোককে শাস্তি বিধানের জন্য একমত হয়েছে যারা অন্যের অনুভূতিকে তুচ্ছ বা হেয় করে -

- অন্যকে তার সম্মতি ক্রমেও পতিতাবৃত্তিতে প্ররোচিত করে ও পথ দেখায় এবং
- সম্মতি সত্ত্বেও কারো পতিতাবৃত্তিকে শোষণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979)

এই সনদের যে ধারাগুলি পরোক্ষভাবে নারী পাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে তা হলো -

- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীকে নিয়ে সব ধরণের অবৈধ ব্যবসা এবং দেহব্যবসার আকারে নারীর শোষণ দমন করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (পরিচ্ছেদ- ১, ধারা-৬)।
- পেশা ও চাকুরী স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার অধিকার; পদোন্নতি, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং চাকুরীর সকল সুবিধা ও শর্ত ভোগ করার অধিকার এবং শিক্ষানবীস হিসেবে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার (পরিচ্ছেদ-৩, ধারা-১১ এর ১.গ)।

শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯

(Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989)

এই সনদে শিশু পাচাররোধ এবং পাচারকৃত শিশুদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহকে যেসব নির্দেশনা দান করেছে তা হলো-

অনুচ্ছেদ ১১

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ বিদেশে শিশু পাচার এবং বিদেশ থেকে শিশুকে নিজ দেশে ফিরতে না দেয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২. এ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হবে অথবা বিদ্যমান চুক্তিগুলোতে শামিল হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪

অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকার যৌন শোষণ ও যৌন নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ রোধ করতে, অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সকল উপযোগী পদক্ষেপ নেবে:

ক) কোন বেআইনী যৌনকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত করা কিংবা বাধ্য করা;

Dhaka University Institutional Repository

খ) পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্য কোন বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদের শোষণমূলকভাবে ব্যবহার করা;

গ) যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোন ক্রিয়াকর্ম বা সামগ্রীতে শিশুদেরকে অপব্যবহার করা।

অনুচ্ছেদ ৩৫

- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যেকোন উদ্দেশ্যে বা যেকোন ধরণের শিশু অপহরণ, বিক্রয় বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

ভিয়েনা ঘোষণাপত্র এবং বাস্তবায়নকারী কর্মসূচী ১৯৯৩
(The Vienna Declaration and Programme of Action 1993)

৩. নারীর সমমর্যাদা এবং মানবাধিকার

অনুচ্ছেদ ৩৮

- বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন বিশেষতঃ ব্যক্তিজীবন ও জনজীবন থেকে নারী নির্যাতন, সকল ধরণের যৌন নিপীড়ন, শোষণ ও নারী পাচার দূর করার লক্ষ্যে কাজ করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ১৯৯৫
Beijing Platform for Action 1995

ঘ. নারী নির্যাতন

কৌশলগত লক্ষ্য ঘ - ৩

নারী পাচার বন্ধ করা এবং বেশ্যাবৃত্তি ও পাচারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা।

যে সব পদক্ষেপ নিতে হবে-

১৩০. যে দেশ থেকে নারী পাচার ঘটে, যে দেশের মধ্য দিয়ে পাচার হয় এবং গন্তব্য; সে সকল দেশের সরকার, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের করণীয়:

ক) নারী পাচার এবং দাসত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো অনুমোদন ও কার্যকর করার বিষয়টি বিবেচনা করা;

Dhaka University Institutional Repository

খ) নারী পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে বেশ্যাবৃত্তি ও বিভিন্ন ধরণের যৌন ব্যবসা, জোর করে বিয়ে ও শ্রম আদায়ের জন্য নারী ও মেয়ে পাচার প্রভৃতি উৎসাহিত করে যে সব ঘটনা, তার মূল কারণ এবং সেই সাথে বাহ্যিক কারণগুলো দূর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং নারী ও শিশুদের অধিকারগুলো সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান আইনগুলো কঠোর করা। সহিসংতার হোতাদের ফৌজদারি ও দেওয়ানী উভয়বিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা;

গ) নারী পাচারের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বিত তৎপরতা জোরদার করা;

ঘ) পাচারের শিকার যারা তাদের চিকিৎসা ও সমাজে পুনর্বাসনের জন্য কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি চালু করার জন্য সম্পদ বন্টন করা। তাদের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঙ) শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও নীতিমালার উন্নয়ন সাধন এবং তরুণী ও শিশুদের নিরাপত্তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যৌন পর্যটন ও পাচাররোধের লক্ষ্যে আইন পাস করানোর বিষয়টি বিবেচনা করা।

পাচার প্রতিরোধে জাতিসংঘের নতুন প্রোটকলের নির্দেশনা ২০০১

Guide to the New UN Trafficking Protocol 2001

প্রোটোকলের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো-

- পাচারকৃতরা বিশেষ করে যে সকল নারী ও শিশুকে পতিতাবৃত্তি ও শিশু শ্রমে বাধ্য করা হয় তাদেরকে অপরাধী না বলে অপরাধের শিকার মনে করা।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পাচার আন্তর্জাতিক ভাবেই প্রতিরোধ করতে হবে। যদিও পাচারকারী, পতিতা সর্দার, জোরপূর্বক শ্রম সরবরাহকারী, অপহরণকারী চক্র সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী তারপরও এই প্রোটোকল পুলিশ, বহির্গমন কর্তৃপক্ষ, সামাজিক সংগঠন এবং এনজিওসমূহকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে উৎসাহ যোগাবে (অনুচ্ছেদ ১০)।
- যেহেতু পাচারের একটি সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা এবং বিচার পদ্ধতি আছে তার ভিত্তিতে পাচার প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়েই আইন তৈরী করা যেতে পারে। সেই সাথে বিভিন্ন দেশের আইনের সমন্বয় সাধন সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

- পাচারের শিকার সকল নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ঠিক তাদের মতো নয় যারা ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে (অনুচ্ছেদ ৩ ক, খ)।
- পাচারের সময় নারী ও শিশুর সম্মতি অপ্রাসঙ্গিক (অনুচ্ছেদ ৩ খ)।
- সংজ্ঞায় এটা সুস্পষ্ট যে অসৎ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ভয়ভীতি প্রদর্শন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেই পাচার করা হয় না, অনেক সময় তাদের দুর্বলতার সুযোগ যেমন- দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে পাচার করা হয় (অনুচ্ছেদ ৩ ক)।
- পাচারের এই নতুন সংজ্ঞা নির্যাতিতকে এই মর্মে নিশ্চিত করেছে যে ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব তার নয় (অনুচ্ছেদ ৩ খ)।
- পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিতকরণ ও পাচারকে পৃথক করা যাবে না। এই প্রোটোকল স্বীকার করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পতিতাবৃত্তির জন্য অথবা অন্যভাবে যৌন চাহিদা পূরণের জন্য পাচার করা হয় (অনুচ্ছেদ ৩ ক)।
- যে সকল নারী ও শিশুকে দেশের অভ্যন্তরে পতিতাবৃত্তি অথবা শিশু শ্রমের জন্য পাচার করা হয়, তাদেরকে দেশের বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। মূল কনভেনশনের ৩নং অনুচ্ছেদে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- পাচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে শোষণ করা (অনুচ্ছেদ ৩ ক)।
- নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে এই প্রোটোকল হচ্ছে জাতিসংঘের প্রথম পদক্ষেপ যা সকল দেশকে এই প্রোটোকলের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন অথবা অন্যান্য পদক্ষেপ নেবার আহবান জানাচ্ছে যেন নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার অনিয়ম দূর করা যায়।
- এই প্রোটোকল মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দমন এবং পাচারকারীদের শাস্তি নিশ্চিতকরণার্থে ১৯৯৪ সালের পাচার ও পতিতাবৃত্তি বিরোধী কনভেনশন এবং শিশু অধিকারের কনভেনশনের ভিত্তিতে রচিত। নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাগ্রহে এই প্রোটোকল গ্রহণ করে। (অনুচ্ছেদ ৯.৫)

আঞ্চলিক সনদ ও চুক্তি

সার্ক সনদ ২০০২

(SAARC Convention 2002)

সার্ক সনদের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো-

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ- ১ (প্রস্তাবনা)

পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচারকে মানব মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন বিবেচনায় গুরুতর অপরাধ হিসেবে গুরুত্ব দেয়া।

অনুচ্ছেদ- ৬

পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচার প্রতিরোধে পাচারকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য তদন্ত, শনাক্তকরণ, নিবারণ, মামলা ও শাস্তি নিশ্চিত করণে আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়া।

অনুচ্ছেদ- ৭

পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচারকৃতদের পুনর্বাসন এবং প্রত্যাবাসন-এর ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদানে সর্বোচ্চ সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দেয়া।

ধারা- ১.৩

- পাচার অর্থ বাধ্যতামূলক অথবা অন্য যেকোন উপায়ে অথবা পাচারকৃত ব্যক্তির সম্মতিতে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোন নারী ও শিশুকে স্থানান্তর, বিক্রয় অথবা ক্রয় করা।

ধারা- ২

- এ সম্মেলনের লক্ষ্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা যেন তারা নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, নিবারণ, দমন; প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আন্তর্জাতিক বিশেষ করে সার্ক অঞ্চলে উৎস, ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশে পতিতাবৃত্তি চক্রে নারী ও শিশু ব্যবহারকে প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারে।

ধারা- ৫

- সদস্য রাষ্ট্রের বিচার সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে এবং ভিকটিমদেরকে যথাযথ নির্দেশনামূলক উপদেশ (Counseling) ও আইনগত সহায়তা প্রদান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা- ৮

- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ তাদের স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, পদ্ধতি এবং উপকরণ সরবরাহ করবে যাতে তারা অপরাধের ফলপ্রসূ অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় সক্ষম হয় (৮.১)।
- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সম্মেলনের বাস্তবায়ন সহজতর করা এবং পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার দায়িত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক একটি আঞ্চলিক বাহিনী (Regional Task Force) গঠন করবে (৮.৩)।
- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ সম্মেলনের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন ও পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে সহযোগীতার কৌশল নির্মাণে পারস্পরিক চুক্তি ও দ্বিপক্ষীয় নির্মাণ-কৌশল বিন্যাস করবে (৮.৪)।

ধারা- ৯

- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পাচারকৃতদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।
- সীমান্ত অতিক্রমকারী যে সকল পাচারকৃতের প্রত্যাবাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণকরণ অমীমাংসিত রয়েছে তাদেরকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এছাড়া এ সকল ভিকটিমদের জন্য আইনী পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সরবরাহ প্রাপ্তিসাধ্য করতে হবে।
- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পাচারকৃতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিরাপত্তামূলক গৃহ বা আশ্রয় এর ব্যবস্থা করবে। এছাড়া এ সকল ভিকটিমদের উপযুক্ত আইনী পরামর্শ, কাউন্সিলিং, চাকুরী প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা সরবরাহ মঞ্জুর করবে।
- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পাচারকৃতদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর লক্ষ্যে এ ধরণের নিরাপত্তামূলক গৃহ বা নিরাপদ আশ্রয় প্রতিষ্ঠায় স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে ক্ষমতা প্রদান করবে।
- অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পাচারকৃতদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর লক্ষ্যে এ ধরণের নিরাপত্তামূলক গৃহ বা নিরাপদ আশ্রয় প্রতিষ্ঠা সহ পাচার প্রতিরোধ ও পাচরকৃতদের পুনর্বাসন এর প্রচেষ্টায় স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ প্রদান করবে।

[উৎস: SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আইন ও নীতিমালা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০

আইনের ধারা ৫-এ বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে-

১) কোন নারীকে বিদেশ থেকে আনয়ন করেন বা

২) বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা

৩) ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্যকোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন তাহলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডের বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যূন ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।

ধারা - ৬

যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

ধারা-৭

যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতিত কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।

পাচারের মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত আইন

দণ্ডবিধি ১৮৬০, ধারা ৩৪২ - ৩৪৬ঃ কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে অন্তরীণ করে রাখলে, যতদিন অন্তরীণ করে রেখেছে তার ভিত্তিতে ১-৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৩৬৩ঃ অপহরণ, দাসত্ব ও বলপূর্বক শ্রম আদায়ের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। কেউ কাউকে অপহরণ করলে সর্বোচ্চ ৪ বছর কারাদণ্ড পেতে পারেন।

ধার ৩৬৪ (ক)ঃ দাসত্ববৃত্তি, বলপূর্বক শ্রম আদায় বা পাশবিক বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কেউ ১০ বছরের নিচে বয়স্ক কাউকে অপহরণ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

ধারা ৮, ৩৬, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৭৩ এবং ৩৭৪ঃ ১৮ বছরের নিচে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকে অপহরণ করলে তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে।

অর্থনৈতিক পাচার দমন আইন ১৯৩৩, ধারা ৮ - ১২ঃ ১৮ বছরের নিচে যে কোন নারীকে পতিতালয়ে বন্দি করে রাখার জন্য শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কোন মহিলাকে আনয়ন, উদ্বুদ্ধকরণ বা সাহায্য করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা।

শিশু আইন ১৯৭৪, ধারা ৪ (৩৫)ঃ কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে বলপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করলে তাকে অর্থদণ্ড দিতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং তাদের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৮ (১) এ বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। অনুচ্ছেদ ২৮ (২) এ বলা হয়, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলো হলো-

Dhaka University Institutional Repository

১. জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;

২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৩. নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

৪. নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;

৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;

৬. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৭. নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

৮. নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৯. নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;

১০. প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

১১. বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা;

১২. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া;

১৩. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

জাতীয় শিশু নীতিমালা ১৯৯৪

শিশু নীতিমালায় শিশুর নিম্নোক্ত আইনগত অধিকার-এর কথা বলা হয়েছে।

১. প্রচোলিত আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের সময় শিশুদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া;

২. শিশুরা যাতে কোন অপরাধের কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট – ৩

পাচারকৃতদের চিত্র

কলকাতায় একটি বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত পাচারকৃত বাংলাদেশী শিশুদের সাথে গবেষক

কলকাতার বৌবাজার পতিতালয়ে বাংলাদেশী পাচারকৃত যৌনকর্মী নারীদের সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয়কেন্দ্রে অন্যান্য শিশুদের সাথে উদ্ধারপ্রাপ্ত পাচারকৃত ছেলে শিশুরা
এসিডি, রাজশাহী।

আশ্রয়কেন্দ্রে অন্যান্য শিশুদের সাথে নৃত্য প্রশিক্ষণরত পাচারকৃত শিশুরা
এসিডি, রাজশাহী।

Dhaka University Institutional Repository

দুবাই এ উটের জকি হিসেবে কাজ করেছে এমন পাচারকৃত প্রত্যাবাসিত শিশুরা
ট্রান্সিটহোম, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রাপ্ত পাচারকৃত শিশুরা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শেল্টারহোম, যশোর।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয়কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত পাচারকৃত মেয়ে শিশু
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শেল্টারহোম, যশোর।

পাচারকৃতদের হাতের কাজ
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শেল্টারহোম, যশোর।